উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ রচনা

স্বপ্না দে

382696

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর, ১৯৯৯

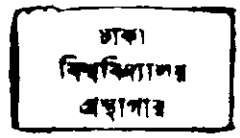

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, স্বপ্না দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ রচনা" শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ রচনা করে পরীক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩৮৮/১৯৯২-৯৩

তাঁর এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এই অভিসন্দর্ভের কোন অংশ কোথাও ছাপা হয়নি।

২৯.১২.৯৯

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল. গবেষক হিসেবে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি আমার প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভের বিষয়-

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ রচনায়' মনোনিবেশ করি। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অভিমত পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা আমার গবেষণা কর্মকে সহজতর করেছে। আমার গবেষণার বিষয় সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ গবেষণা কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

অভিসন্দর্ভ রচনা সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর নিরন্তর তাগিদ ও প্রেরণার ভূমিকা অপরিসীম।

গবেষণা কালে আমি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারের সহায়তা নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ রচনার' সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে।

382696

এ সময়ের রচনা সমূহ আমাকে আকৃষ্ট করে। এ কারণে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ রচনাকে আমি এম.ফিল. গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর নির্মাণের কাল, একদিকে শিল্পপুঁজি ও বাণিজ্য পুঁজির প্রসার ও অন্যদিকে প্রাচীন সামন্ত সমাজ ও ঐতিহ্য পরিপ্রেক্ষিত হয়ে বাংলা গদ্যের জন্ম, ক্রম বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দিকে বাংলা গদ্যে সমকালীন সমাজ এবং নব্য মধ্যবিত্ত ও নব্য বণিক, ধনিক শ্রেণীর অসঙ্গত আচরণ নক্‌শা চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।

নক্‌শা চিত্রের পাশাপাশি এ সময়ের কোন কোন লেখককে উপন্যাস সুলভ কাহিনী নির্মাণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে।

আমি গবেষক হিসেবে এ সময়ের বাংলা গদ্যের ব্যঙ্গ রচনার বিষয় ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। বিংশ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যঙ্গ রচয়িতা আবির্ভূত হলেও আমার গবেষণার সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকায় তাঁদের সম্পর্কে কোন আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি । উনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ রচয়িতাদের রচনায় বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ রচনার প্রবণতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২

প্যারীচাঁদ মিত্র ২৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৪১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫২

কালীপ্রসন্ন সিংহ ৯৪

মীর মশাররফ হোসেন ১১৫

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৭

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪

উপসংহার ১৪০

পরিশিষ্ট ১৪৪

গ্রন্থপঞ্জি ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধোত্তর ইংরেজ বণিকদের ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং দেশীয় বাণিজ্যে ক্রম সম্প্রসারণশীল আধিপত্য কায়েম বাংলার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ভুবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিকে প্রাচীন ভূস্বামীদের অন্তর্ধান এবং অন্যদিকে নব্য জমিদারতন্ত্রের প্রভাব সর্বোপরি বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থার উদ্ভব কলকাতা তথা বাংলার জন জীবনে সৃষ্টি করে ভাব-সংঘাত।

বাঙালীর জীবনে ভাবসংঘাতের আরও একটি কারণ ছিল ইংরেজী শিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নবউদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী রক্ষণশীল সনাতন ধর্মের বিধিব্যবস্থাকে অস্বীকার করে হয়ে ওঠে বিপ্লবী অন্যদিকে নব্য জমিদার ও বণিক তন্ত্রের লালিত পালিত সন্তানরা সমাজ জীবনে নবভাব আলোড়নের নঞর্থক প্রতিক্রিয়াসমূহ তাদের জীবন-যাপনে, আচার-আচরণে প্রকাশ করতে থাকে ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে সৃষ্টি হয় ব্যঙ্গ রচনা।

ব্যঙ্গরচনার আবির্ভাব মূলত নক্সাজাতীয় বা বাস্তব উপাখ্যানের বিবৃতির প্রাক্ সূচনা পর্বে ভাববাদ, আদর্শবাদ এবং কাল্পনিক জগতের মূল্যবোধ সমূহের বিপরীতধর্মী রচনা হিসাবে ব্যঙ্গ রচনার আত্মপ্রকাশ বাস্তবজীবনের যে সব অনুষঙ্গসমূহ সাহিত্য জগতে প্রাধান্য পেত সেগুলির প্রতি ব্যঙ্গ রচয়িতার দৃষ্টি অনিবার্য আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে নিবদ্ধ হয়।

মহাকাব্য কিংবা রোমান্স মূলক রচনায় বাস্তব জগত সম্পর্কে আদর্শবাদী লেখকরা যে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন এবং আদর্শের জগতকে প্রতিপন্ন করেন ইতিবাচক রূপে ঠিক তারই বিপরীত মেরুতে ব্যঙ্গ রচনার অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঙ্গরচনা বা satire এর বিকাশ ঐ পর্বে সম্পন্ন হয় যখন আমাদের বৈশ্বিক সভ্যতার জগত ভাববাদী, আদর্শ প্রভাবিত জীবন দর্শন থেকে আদর্শহীন বাস্তবতার দৈনন্দিনতায় পূর্ণ জগতের দিকে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। satire এর প্রধান মূল্য এটা দর্শককে খুব প্রভাবিত করতে পারে বলা যেতে পারে আপেক্ষিক ভাবে / তুলনামূলকভাবে satire সামাজিক এবং আদর্শিক জগতের বাস্তব দিকটি বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যের মাধ্যমে মূর্ত করতে সক্ষম। এখানেই satire এর জয় সূচিত হয়েছে, epic, romance এবং পবিত্র কল্পকথার উপরে । satire এর রয়েছে দ্বিপ্রান্তিক বাস্তবতা। প্রচলিত মূল্যবোধ ভারাক্রান্ত ঐতিহ্যবাহী সমাজের সংহতির মধ্যে এক প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করে satire । এ জন্যই একজন satirist এর অবদানকে মূল্যায়িত করা অত্যন্ত কঠিন।

satire এর আবির্ভাবের পূর্বে epic গুলো সাধারণত ছিল দীর্ঘ বর্ণনামূলক কাহিনীনির্ভর, যে গুলো মূলত ছিল সৌন্দর্য বর্ণনায় ভারাক্রান্ত। অন্যদিকে satire এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নির্ভর চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। মানব-জীবনের সমস্যা জর্জরিত গুণাবলীকে উপন্যাসে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। don quixot-এ দেখা যায় চরিত্রটি কোন একটি সুনির্দিষ্ট পরিসমাপ্তির দিকে না গিয়ে বরং চরিত্রটি মানব-জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্বময়, সমস্যায় জর্জরিত । একই ধরনের পরিণতি আমরা দেখতে পাই jonathan swift's এর gulliver's travel's-এ। dickens তাঁর "hard times" পুস্তকে এই বোধটি ধরে রাখতে পারেননি অনেকে Satire দিয়ে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত Satire এর ধরনটি ধরে রাখতে সক্ষম হননি । উপন্যাসের শেষ প্রান্তে এসে সৌন্দর্য নির্ভর দীর্ঘ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায় কখনও কখনও তাঁরা তাদের বুদ্ধিভিত্তিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাস্তব জগৎ, ভাব জগতের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান গ্রহণ করেন । শেষে আমরা একটি কাল্পনিক জগতে অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবিষ্ট হই এবং নায়কের শুভ কামনায় আবেগ গত দিক দিয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়ি । বাস্তব জগৎ এবং ভাব

Dhaka University Institutional Repository

জগতের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে নিরসন কল্পে swift's এবং dickens প্রখর যুক্তিবোধের বদলে সাধারণ জ্ঞান ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন ।

When satire become illustrative therefore, it is frequently characterized by images of the ugly and the absurd, which are understood to illustrate aspects of the world and to function in at least an implied contrast to aspect of an ideal world whose validity is being tested". (Meaning in Narrative, P.113)

যেহেতু ব্যঙ্গ রচনা সম্প্রসারিত হয়েছে, সেহেতু বারংবার তা কুৎসিত ও অদ্ভুত অযৌক্তিক ধারণা দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত যাতে বাস্তব বিশ্বের দৃশ্যাবলী ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয় এবং আদর্শ বিশ্বের দৃশ্যাবলী বিপরীত ধারণায় সংযুক্ত যার ন্যায্যতা বিচারাধীন।

গল্পে বা কবিতায় ব্যক্তিগত বিদ্রূপাত্মাক আক্রমণকেও ব্যঙ্গ রচনা বলে। ব্যঙ্গ রচনা কৌতুকপূর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হয়, সেখানে ব্যঙ্গবিদের কল্পনাপ্রবণ মন দূর বিস্তারি হয়। তবে এক্ষেত্রেও বক্রাঘাতপূর্ণ মন্তব্য অপ্রকাশিত থাকে না। আবার অশোভন ভাষার ব্যবহার ব্যতীতই এর বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণতা লাভ করে

ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্র অসীম। ব্যঙ্গবিদ তাঁর সমকালের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে একাত্ম হতে না পেরেই আশ্রয় গ্রহণ করেন ব্যঙ্গাত্মক পরিভাষার । ব্যঙ্গকার বাস্তব মানুষের জীবনবোধ ও কর্ম প্রণালীর উৎকট অনুষঙ্গসমূহ এবং অন্তরালের ঘটনাপুঞ্জ দেখাতে চেষ্টা করেন . উপরন্তু ব্যঙ্গকার মূল্যবোধ, নৈতিকত , ধর্ম, ধর্মাদর্শ রক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

He is a man(women satirists are very rare) who takes it upon himself to correct and ridicule the follies and vices of society and thus to bring contempt and derision upon aberrations from a desirable and civilised norm. (A Dictionary of Literary Terms, p-66)

কেউ কেউ মনে করেন ব্যঙ্গকার বিচারক নন যদিও তিনি সমাজ কিংবা ব্যক্তির দোষ ত্রুটি কৌতুক হাস্যের মধ্য দিয়ে উন্মোচন করেন। প্রত্যেক ব্যঙ্গকার নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শুদ্ধিকরণে সচেষ্ট হন। বাস্তব ঘটনাবলীর মাধ্যমে আপাত সত্য অনুষঙ্গসমূহ অথবা কল্পনাকে আশ্রয় করে ব্যঙ্গ রচয়িতা তাঁর ক্ষেত্র প্রসারিত করেন।

এক্ষেত্রে রূপক, চিত্রকল্প, প্রবাদ, প্রবচন উপহাস, সুভাষিত মন্তব্য প্রভৃতি সাহিত্যের কলাকৌশল অবলম্বিত হয়। এ সবের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য কার্যকর তা হলো সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের মাধ্যমে সৎ গুণাবলী আনয়ন করা।

ব্যঙ্গকার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও সামাজিক ব্যাধিসমূহ সংশোধনের চেষ্টা করেন। অনাচার লালিত রক্ষণশীল জনগোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন এবং প্রগতি পন্থীদের অতিশয্য ব্যঙ্গবিদের কলমের আঁচড়ে সুস্পষ্ট হয়।

যদিও ব্যঙ্গকার যা দেখেন ও শোনেন, তিনি তার উপর মন্তব্য রাখেন এবং একেবারে নগ্ন করে দেয়ার ইচ্ছে তাঁর থাকে না, কিন্তু ব্যঙ্গের কথা ভিন্ন। ব্যঙ্গকে ভদ্র চেহারা দেয়ার জন্য কিছুটা কৌতুক মেশাতে হয়। সাহিত্যে উচ্চস্থান পেতে হলে ব্যঙ্গকে একটুখানি ভদ্র চেহারার হতে হবে। কেননা ব্যঙ্গ যে গালি

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া অথচ সোজা গাল দেওয়া নয়। কিন্তু ব্যঙ্গ রচনায় কতটা কৌতুক বা বাগবৈদগ্ধ মেশাতে হবে, তা রচয়িতার মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে। প্রচ্ছন্ন আক্রমণের কতটা প্রচ্ছন্ন রাখতে হবে তারও নির্দেশ দেওয়া যায় না। তাছাড়া ব্যঙ্গ রচনা পাঠে যদি দর্শক বা পাঠকের মনে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যটির কোন ছাপ না পড়ে যদি তা হাস্য কৌতুকেই শেষ হয়, তবে তা ব্যঙ্গরূপে সার্থক নয় বুঝতে হয়।

We must be prepared to find the writer of comedy losing him moral neutrality and slipping into satire and the satire and satirist occasionally loosening his contral over the reader and relanig in to comedy. (A Dictionary of Literary Terms, P. 67)

রোমান কবি Horace এবং Juvenal ব্যঙ্গ সাহিত্যের অনন্য মাধ্যম হিসাবে কবিতাকে প্রাধান্য দেন তাঁরা তাঁদের ধারণার উপর যদিও জোর দিয়ে ছিলেন তবুও সেটা ছিল খুবই দুর্বল। Horace তার তিনটি ব্যঙ্গ রচনায় সমকালীন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষ- ত্রুটি তুলে ধরেন। যদিও সে গুলো হাস্যরসাত্মক ছিল তবু সে গুলো পরিশেষে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ড্রাইডেন, আলেকজান্ডার পোপ তাঁদের প্রজ্ঞার মাধ্যমে সাবলীলভাবে এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। jonathan swift এর 'গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' মার্ক টোয়েন এর 'রহস্যজনক আগন্তুক', 'অন্ধকারে উপবিষ্ট ব্যক্তি' ব্যঙ্গ রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য

রোমান ব্যঙ্গ সাহিত্য তার রচনা শৈলীর চেয়ে গঠনের মধ্যেই বেশী সীমাবদ্ধ ব্যঙ্গ কবিতা গুলো এমন এলোমেলো ভাবে রচিত যে, তাদেরকে কোন সাহিত্যিক শ্রেণীতে ফেলা খুবই কষ্টসাধ্য যদিও একজন

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক পন্ডিতের মতে কবিতাগুলোর উপরিস্থিত জটিলতার আড়ালে রয়েছে এমন একটি পাঠনিক নীতি যা সব রোমান ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে দেখা যায় এবং তাদের ইংরেজ এবং ফরাসী অনুসারীদের মধ্যেও একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। এই কবিতাগুলো দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথমত এতে রয়েছে একটি তাত্ত্বিক অংশ যাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোন দোষ ত্রুটিতুলে ধরা হয় এবং দ্বিতীয়ত এতে সরাসরি এর বিপরীতধর্মী সৎগুণাবলীর সুপারিশ করা হয়। তবে এ'দুই অংশের দৈর্ঘ্য ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে রয়েছে বৈষম্য। কারণ ব্যঙ্গ সাহিত্যিকরা সৎগুণাবলী উন্মোচনের চাইতে খারাপ দিকটা প্রদর্শনেই সব সময় বেশী তৎপর। বেশীভাগ ব্যঙ্গাত্মক কবিতাই একটি কাঠামোয় রচিত এবং এ কাঠামোটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ রচনাকারী ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘটিত কোন দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই গঠিত। প্রতিপক্ষের ভূমিকা সাধারণত গৌণ যে রচয়িতার মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে কবিতার বিষয়বস্তুর প্রতিফলনের ফলে কাব্যরূপ নাট্যরূপ পরিগ্রহ করে।

যদিও রোমান ব্যঙ্গ সাহিত্যের পরিধি অল্প তবুও তা এসাহিত্য শাখার প্রায় সকল উপাদানই ধারণ করে বিদ্রূপের মাধ্যমে কারও চারিত্রিক বা ধারণার ভ্রান্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যই হল এ সাহিত্যের মূল আদর্শ ব্যঙ্গ সাহিত্যের লক্ষ্য সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও ব্যক্তি চরিত্রের ভুলত্রুটি উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে সংশোধনের পথের সন্ধান দেওয়া। ব্যঙ্গ কাব্যের গঠন কৌশল হিসাবে "Iandic" ধারা প্রচলিত। এ সাহিত্যের এক যাদুকরী ভূমিকা রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর গ্রীক কবি Archilocheus প্রথম ব্যঙ্গ রচয়িতা, সেখানে তিনি এথেন্সের এক রাজ পরিবারের জীবন চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হন প্রাচীন আইরিশ সাহিত্যেও ব্যঙ্গের ভূমিকা অনন্য সাধারণ ।

বিশ শতকের খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা তাদের সাহিত্যকর্মে ভাবগত, ভাষাগত এবং অন্যান্য কৌশল অবলম্বনে ব্যঙ্গ সাহিত্যকে এক সার্থক সাহিত্য হিসাবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন গ্রীসে ব্যঙ্গ রচনার শুরু থেকেই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ব্যঙ্গাত্মক রচনার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ সব সাহিত্যের উদ্দেশ্যই নৈতিক শিক্ষাদান করা । গদ্যতে বা পদ্যতে যে ভাবই উপযোগী মনে হোক ব্যঙ্গাত্মক ধারা সবক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করে। এর লক্ষ্যমাত্রা পোপের নির্বোধ ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমগ্র মানবজাতির উপর বিস্তৃত হয় যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় ডন উইলমটের "মানবজাতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ" (১৬৭৫) নামক বই এর সাহিত্যরূপ ও এর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির মতই বিচিত্র। সামাজিক অসংগতির বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক মধ্যযুগীয় বেনামী পংক্তিমালা থেকে শুরু করে চসারের তীক্ষ্ণক্ষুরধার সম্পন্ন কবিতা এবং রাবেলেইয়ের হাস্যরস পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

বেন জনসন এবং মলিয়েরের নাটকেও ব্যঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় । এমনকি কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য রচনা করতে গিয়েও আলডোস হাক্সলে এবং অরওয়েল প্রমুখেরা ব্যঙ্গ রচনার আশ্রয় নেন। উপন্যাসের মত সামাজিক কাহিনীর ক্ষেত্রে যেখানে সমাজের কুৎসিত বাস্তবতা স্থান পায় যে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ সহজেই মানিয়ে যায় কিন্তু কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য তৈরীর ক্ষেত্রেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ব্যবহার অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু টমাস মুর এ ধরনের কাল্পনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ব্যঙ্গকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছেন ।

ব্যঙ্গ রচয়িতার সাথে আইনের সম্পর্ক সবসময়ই সুন্দর এবং জটিলও বটে। Horace ও Juvenal দুজনেই কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

১৫৯৯ সালে Archbishop of Canterbury ব্যঙ্গ প্রকাশের ক্ষেত্রে এক বিধি নিষেধ জারি করেন আজকাল ব্যঙ্গ রচয়িতা বা ব্যক্তিগত শত্রুতা ও প্রকাশকের আর্থিক সুবিধার কারণে কাজ করতে বেশী অভ্যস্ত। ফলে অনেক দেশে এর চরম শাস্তির বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে

Dhaka University Institutional Repository

স্টালিনের উপর ব্যঙ্গ রচনার জন্য U.S.S.R এ কবি Osip Mandalstam কে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু পরবর্তী সোভিয়েতে ব্যঙ্গ রচনা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যঙ্গ রচয়িতা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের ভ্রম সংশোধনের নিমিত্তে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই তার সাথে আইন এবং পাঠকের নিবিড় সম্পর্ক। নিন্দাবাদ রচয়িতার আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং নিন্দাবাদের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য পরোক্ষ উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন ব্যঙ্গকার ।

ব্যঙ্গের প্রকারভেদ

পাশ্চাত্যের সাহিত্য রীতি অনুসারে ব্যঙ্গসমূহকে 'জুভেনালী ব্যঙ্গ' এবং "হোরেসী ব্যঙ্গ" এ দু-ভাগে ভাগ করা হয়।

Horace is the lalerant, urbane and amused spectator of the human Scene; Juvenal is bitter misanthropic and consumed with indignation. (A dictionary of literary Terms, P-77)

হোরেস নরমপন্থী জুভেনাল চরমপন্থী পোপের কিছু রচনা "হোরেসী" আবার কিছু রচনা জুভেনালী ধরনের ।

Northop Frye সম্প্রতি জোর দিয়ে বলেছেন যে "Menippean" ব্যঙ্গ রচনা এর সুরেলা আওয়াজ বা কণ্ঠস্বরের চেয়ে তার গঠনকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে। Menippean সাহিত্যকর্ম হারিয়ে গেছে কিন্তু তার উত্তরসূরীরা আজও বেঁচে আছে। Northop Frye তাঁর Anatomy of Criticism এ বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"Menippean Satire " deals less with people than with mental attitudes", and he places swift's Gulliver in this category along with work by petronius, Rabelais, Valtarire, Lewis carrall and Aldous Huxley Menippean satire (P.77)

Frye এর প্রস্তাবনায় অবশ্য 'The Anatomy' তে প্রতিস্থাপিত হবে যথারীতি হাস্যরসের দাবীদার জ্ঞানী লোক (গোঁড়া স্কুল শিক্ষক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী) উপস্থাপনায় তার চরিত্রগুলো বাস্তবাদী নয় কিন্তু পান্ডিত্য পূর্ণ ধারণার মুখপাত্র যা তাদের বিদ্যায় তাদের হাস্যকর করে তোলে। "Menippean" এর ছোট ব্যঙ্গরচনাগুলোর সংলাপ অনেক সময় সদৃশ, ঢিলেঢালা ও অভিনব ভাবে বোনা এবং যথারীতি বক্তাদের একত্রে কোন স্বভোজনে বা সম্ভ্রান্ত বাসগৃহে নিয়ে আসে সেখানে তারা বিদ্যার সাথে তাদের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ধারণা এবং নিজেদের অভিভূত হওয়া এমনি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যঙ্গ রচনাকে মাঝে মাঝে তির্যক ও নিয়মানুগ যথাযথ ব্যঙ্গ রচনায় বিভক্ত করা হয়। তির্যক ব্যঙ্গ রচনায় লেখক তার সৃষ্ট চরিত্র গুলোকে অবজ্ঞার সাথে একটি গল্পে উপস্থাপনা করেন। কিন্তু একটি যথাযথ ব্যঙ্গ-রচনায় কোন গল্প থাকেনা : কেবল মাত্র বক্তাই লেখক যে নিজেকে তার দর্শনীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। Byron তাঁর নিয়মানুগ ব্যঙ্গ-রচনায় লিখেছেন। Prepare for Rhyme- I'll publish, right or wrong Foals are my theme, let satire be my song" (A dictionary of literary Terms, p-78)

Ezra pound, Horatiah Juventian, Menippean এবং অন্যান্য সকল ব্যঙ্গরচনার উপর সমানভাবে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ব্যঙ্গরচনা স্মরণ করে দেয় যে বিশেষ মূল্য বিশিষ্ট জিনিসগুলো নিশ্চয় ক্ষণকালের জন্য নয়, এটা একজনের সময়ের অপচয়ের বিবেচনায় দাগ কাঁটে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঙ্গ রচনার বৈশিষ্ট্য

১। ব্যঙ্গ সাহিত্যে সমালোচনার কঠোর ভাষা বিদ্যমান।

২। সমাজচরিত্র শুদ্ধিতে এর ব্যবহার ব্যাপক।

৩। ব্যঙ্গ রচনায় রূপকের মাধ্যমে দোষত্রুটি উন্মোচন করা হয়।

৪। চরিত্রসমূহের অবান্তর সংলাপে ব্যঙ্গ নিহিত থাকে।

৫। ব্যঙ্গ রচনায় ঘটনার ঘন-ঘটা দেখা যায়।

৬। কৌতুককর পরিস্থিতি উদ্ভাবন ব্যঙ্গ রচনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৭। আয়নার ফ্রেমে ব্যঙ্গকার সমকালের চরিত্রসমূহের মুখচ্ছবি অঙ্কন করেন।

৮। সুগভীর বেদনার সুতীক্ষ্ণকন্টক ও বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরস ব্যঙ্গ রচনার অন্যতম উপাদান।

৯। পরিবর্তিত সময়ের স্রোতে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ, ও সে বিরোধ ভেঙ্গে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার ব্যঙ্গ।

১০। ব্যঙ্গ রচনা হাল্কা মেজাজ নিয়ে অনেক অপ্রিয় সত্যমোচন করে।

১১। ব্যঙ্গে ভাষা ব্যঞ্জনাময়, পরিশীলিত ও পরিমিত।

১২। ব্যঙ্গের সামাজিক প্রবণতারই ব্যক্তিক অভিব্যক্তি।

১৩। ব্যঙ্গের বিষয় প্রয়োজনীয়, অনিবার্য কিন্তু প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত।

১৪। "To show the incompatibility between traditional moral standard and actual ways of living".

১৫। মানুষের সামাজিক জীবন ও আচরণের বিশ্বস্ত দলিল ব্যঙ্গ রচনাসমূহ।

১৬। লেখকের সমকালীন সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অসংগতিকে জট অনাবৃত করে ব্যঙ্গ রচনা।

Dhaka University Institutional Repository

Satire is a very delicate operation and no man will trust him-self with it except he be in possession of a thorough training a clear purpose and a sound knowledge of moral anatomy. (Frye,1971, P-78)

১৭। ব্যঙ্গের সাধারণ বাচন ভঙ্গি হচ্ছে wit.

১৮। ব্যঙ্গকার সাধারণের তুলনায় আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে গর্বিত আসনের অধিকারী।

১৯। শিল্প সফলতা অর্জনের জন্য ব্যঙ্গ রচনার প্রকাশভঙ্গি নিরাসক্ত ও পরোক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়

২০। ব্যঙ্গের প্রকাশভঙ্গি সহজ-সরল ও অকৃত্রিম হলেও এর অন্তরালবর্তী গূঢ় উদ্দেশ্যের উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

২১। ব্যঙ্গ রচনার বর্ণিত ঘটনা অনেক সময় উদ্ভট ও অদ্ভুত হয়ে থাকে।

২২। ব্যঙ্গ রচনা কখনও প্রচারধর্মী আবার কখন ও বা প্রচার পরিপন্থী।

Dhaka University Institutional Repository

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্তিশালী প্রতিনিধি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২১-১৮৪১) ব্যঙ্গ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সে সময়ে সমাজ সংস্কার ও ধর্মসংস্কারের ভাব বিক্ষোভ ভবানীচরণকে নীরস তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণীত না করে সরস ব্যঙ্গ রচনায় তথা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণ সামাজিক চিত্র রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে বেশী। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩), 'নববিবি বিলাস' (১৮৩০) ত্রয়ীগ্রন্থে ভবানীচরণ তৎকালীন কলকাতা সমাজে নব্য ধনিক শ্রেণীর বিচিত্র অসঙ্গতি ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। 'কলিকাতা কমলালয়ে' (১৮২৩) ভবানীচরণ প্রশ্নোত্তরের ছলে তৎকালীন সমাজের অনুপুঙ্খ চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন।

কলিকাতা কমলালয়-

লেখক 'কলিকাতা কমলালয় বলতে কলিকাতার বিস্তৃত বর্ণনার লিপিবদ্ধ রূপ বুঝাতে চেয়েছেন গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে লেখকের অভিমত স্মরণীয় ঃ

"কলিকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত 'কলিকাতা কমলালয়' নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থ দ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলিকতা কমলালয় শব্দে যোগার্থ রহিল।"

(বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৮, পৃঃ ৩।

সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতায় বিচিত্র জীবন লেখককে আকৃষ্ট করেছিল। লেখক আধুনিক কলকাতার নতুন সমাজ ও অর্থনীতির অভিঘাতে নগরজীবনে যে সব অসঙ্গতি, অসমাঞ্জস্য আচার আচরণ অনুপ্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল সে সব বিষয়কে সরস ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন কলিকাতা মহানগরের স্থূল বিবরণ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিশেষত নগরবাসীদের মধ্যে মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও হঠাৎ ধণিক শ্রেণীর বিচিত্র আচরণ, তাদের ভাষাভঙ্গি, দলাদলি, বিদ্যাঅর্জন, গীতবাদ্য, বিবাহ আচার, শাস্ত্রবিতর্ক প্রভৃতি অনুষঙ্গ লেখকের ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য লেখকের ভাষায় নিম্নরূপঃ

"পল্লীগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোকসকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শংকাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য-ভব্য হইয়াও তাঁহাদিগের নিকট অসভ্য ও অভব্যন্যায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তর ভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লীগ্রাম নিবাসী ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়েরা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লীগ্রাম নিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্পদিবস কলিকাতায় আসিয়া এখানকার রীতিজ্ঞ নহে। তোমার এ কথায় প্রয়োজন নাঞি এ উত্তর নিরুত্তর হইয়া ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থূল বৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন--"। (ভট্টাচর্য, ১৩৭১ পৃঃ ১৯৯)

লেখকের বর্ণনার ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। প্রথম তরঙ্গে কলকাতা নগরের আগন্তুক জনৈক ব্যক্তির বিবরণে তৎকালীন কলিকাতার রীতি ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। নগরকেন্দ্রিক কলকাতার চালচিত্র অঙ্কনে লেখক পল্লীবাসী ও নগরবাসীর কথোপকথনকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পল্লীগ্রাম থেকে আগত ব্যক্তির কলিকাতা নগরের যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তার বিস্তৃত বর্ণনা লেখকের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে উপস্থাপিত হয়েছে। 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা'-অংশে নগরবাসীর মুখ দিয়ে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

পল্লীজীবনের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অন্যদিকে নাগরিক জীবনের পরিবেশে নতুন সমাজের বাস্তব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কলিকাতার নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজে যে নতুন শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ভবানীচরণের লেখায় লক্ষ করা যায়

উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্য মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণীর কলকাতা সমাজের স্পষ্টতর সীমারেখায় বিভক্ত হয়ে পড়ায় প্রথাগত সমাজ কাঠামোর ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে কলিকাতা সমাজে নব্যবণিক শ্রেণী এবং বৈশ্য, কায়স্থের অর্থনৈতিক প্রাধান্য বাস্তব চিত্রের আলেখ্য আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে

"এ সকল কর্ম্মকারি বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা কহিলাম এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের রীতি শুনহ ভগবানের কৃপাতে যাহার দিগের প্রচরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়া ও উদ্বৃও হয় তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনানিপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি [১৮] বা ছয় দণ্ড বেলা সত্ত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহ বা পূরণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।"

(কলিকাতা কমলালয়, পৃঃ ৯)

ভবানীচরণ সামাজিক আচার-আচরণে অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন। তবে সন্ধ্যা পূজা ও দৈবকর্মে, পিতৃকর্মে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার ও বিষয়কর্ম নির্বাহের জন্য উক্ত শব্দ কিভাবে সংক্রামিত হয়েছিল তারই সুনিপুণ চিত্র ভবানীচরণ অংকন করেছেন। নাগরিক সমাজ জীবনে বিদেশী ভাষার শব্দ সম্ভারের সুদীর্ঘ তালিকা বর্ণনানুক্রমিক ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা শহরের নতুন সমাজ ও সে সমাজকে অবলম্বন করে বিভিন্ন দল ও মতের বিরোধ ভবানীচরণের ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ব্রাহ্মণের সামাজিক অধিকারের পরিবর্তে কায়স্থের সামাজিক প্রতিপত্তি ও আধিপত্য লেখকের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গাত্মক বিবরণে উন্মোচিত। বিশেষত সকল দলের দলপতি কায়স্থ জাতি হওয়ার পশ্চাতে হঠাৎ ধনী হওয়ার বিষয়টি ছিল সক্রিয়। এই সব ধনী ব্যক্তির অধিকাংশ সন্তান বিপথগামী ঐশ্বর্য্যে কলকাতার দূষিত আবহাওয়ায় মানুষ আর বিদ্যাঅর্জনের ব্যাপারে বাবু শ্রেণীর ভাগ্যবান লেখকদের অবস্থা আরও করুণ। নানাজাতীয় ভাষার গ্রন্থ ক্রয় করে আলমারিতে সুসজ্জিত রেখে দেওয়াই এদের অন্যতম কাজ । এসব বাবুদের সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

"এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্তা হস্তস্পর্শ তাহাতে করেন না।"(কলিকাতা কমলালয়, পৃঃ ৩৭)

সংরক্ষিত গ্রন্থগুলো বাবুদের কখনো স্পর্শ করতে দেখা যায় না অর্থাৎ কলকাতার বাবুদের বিদ্যা অর্জন এবং আচার আচরণ ও বিলাস ব্যসন কেমন ছিল তার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ভবানীচরণের কলমে উন্মোচিত হয়েছে। কলকাতায় নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে পল্লী সমাজের যে পার্থক্য সূচিত হয়েছিল তার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র কলিকাতা কমলালয়ে বিবৃত হয়েছে ,

"কলিকাতা কমলালয়" গ্রন্থের শেষাংশে শিক্ষা ও গীতবাদ্যাদির প্রতি নূতন সমাজের যে অনুরাগের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, তা যেমন যথাযথ, তেমনই ভবানীচরণের বহুদর্শিতার ফল।" এ ক্ষেত্রে কলকাতা মহানগরে ও গ্রামে যে সব পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব পাঠশালায় বালকদের জন্য পুস্তক প্রস্তুত ও

Dhaka University Institutional Repository

তৎসংক্রান্ত অসঙ্গতির বিবরণ বর্ণিত হয়েছে । বিশেষত ধর্মের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে কলকাতার অনেক ভাগ্যবানরা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করে। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বালকের বিদ্যাঅর্জন বিষয়ে মনযোগী হওয়া । এমনকি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তমবিদ্যা লাভের বিষয়ে ধনী লোকদের আচরণ ভবানীচরণের দৃষ্টি বিচ্যুত হয়নি।

লেখক কলিকাতা সমাজের শ্রেণী বিশেষের দোষ ত্রুটি অঙ্কন করার জন্য বিচিত্র অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন নব্যশিক্ষিত সমাজের মধ্যে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম জীবনাচরণের পরস্পর বিরোধী অনুরাগ বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। কেবল শিক্ষা নয় সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি বিশেষ সমাজের অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে বাবু সমাজের অসঙ্গতি উন্মোচনে এসব অনুষঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রবিচার সঙ্গীত প্রভৃতির পাশে মিথ্যা গল্প বলাও লোকের জন্মগত বৈশিষ্ট্য । তাছাড়া বাবুদের মোসাহেব রূপে খ্যাত এখন পল্লী অঞ্চলের ব্রাহ্মণরাও কলকাতায় এসে বাবু লোকদের দু'বেলা আশীর্বাদ করে নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ নির্বাহ করেন। যে সব বাবুরা নিজেকে বিজ্ঞ মনে করে তারাও এ সব পন্ডিতদের তর্কবিতর্কে অংশ গ্রহণ করে মূর্খতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও মোসাহেবদের দ্বারা পন্ডিত রূপে খ্যাত হয়। 'কলিকাতা কমলালয়ে'র উপসংহারে এদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ

"যে বাবু নিতান্ত বিজ্ঞাভিমানী অতএব ইহাকে বিজ্ঞ বলিলে অধিক সন্তুষ্ট থাকেন, এই হেতু কেহই চতুরতা করিয়া দুইজনে ঐক্য হইয়া ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোটি করিয়া বাবুকে মধ্যস্থ মানেন, কেহ স্মৃতিশাস্ত্রের কোন বচনের উপর দোষ দিয়া তদুদ্ধার নিমিত্ত বাবুকে তাহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করেন, সেই বাবু তাঁহারদিগের চতুরতা বিবেচনা না করিয়া আপন বুদ্ধানুসারে একটা কোন কথা কহেন, পন্ডিত মহাশয়ের সেই কথায় তাঁহাকে সাধুবাদ করত অনেক প্রশংসা করেন বাবুজী তাহাতেই তুষ্ঠ হইয়া কিছু-২

Dhaka University Institutional Repository

দেন ইহাতেই কালযাপন করিতেছেন অতএব তাঁহারদিগের উপর কোন দোষ হইতে পারে না।" (কলিকাতা কমলালয়, পৃঃ৪৮)

'কলিকাতা কমলালয়ে' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতার বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে কলকাতা নগরের বিস্তৃত বিবরণ কিংবা বিচিত্র জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ আলোচ্য গ্রন্থে অনুপস্থিত। একজন নগরবাসী ও একজন পল্লীবাসীর কথোপকথনে সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ উদঘাটিত হলেও কোন ঘটনা কিংবা চরিত্র এ গ্রন্থে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। কেবল বিবরণের মাধ্যমে কলকাতার ক্লেদাক্ত রূপের পাশাপাশি রুচিশীল রূপের চিত্র তুলে ধরেছেন।

"ভবানীচরণের বস্তুজ্ঞান যেমন গভীর ছিল, নীতিজ্ঞানও তেমনই উন্নত ছিল। সেই জন্য যে দিন কলকাতা নগরীর যে ক্লেদাক্ত রূপ দিকে দিকেই প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার কোন পরিচয় তিনি প্রকাশ করতে যান নাই। রুচি, নীতি ও সংযম রক্ষা করিয়াই তিনি ইহাতে সে কালের কলিকাতার রূপটি প্রকাশ করিয়াছেন।" (ভট্টাচার্য, ১৩৭১, পৃঃ ২০২)

নববাবুবিলাস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রভাব দেশের সমাজ জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে আলোড়ন থেকে কলকাতা নগরীতে বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল।

সেই নববাবুদের কিঞ্চিৎ পরিচয় 'কলিকাতা কমলালয়ে' পাওয়া গেলেও তার বিস্তৃত বিবরণ লক্ষ করা যায় 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থে। নব্য ধনীর আদরের পুত্রের মূর্খতা ও উচ্ছৃংখলতার কি পরিণতি ঘটে থাকে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'নববাবু বিলাস' উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে নববাবুদের বিলাস ব্যসন বারবনিতায় আকৃষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া ও মোসাহেবদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া থেকে লেখক নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। বিকৃত জীবনের চিত্র অংকন লেখকের সংস্কার উদ্দেশ্য ব্যঙ্গাত্মাক দৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থটি চার খন্ডে বিভক্ত।

"পুরাতন মঙ্গলকাব্যাদির ঢঙে পয়ার ছন্দে লেখা গণপতি সরস্বতী প্রভৃতির বন্দনা দিয়ে আরম্ভ দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদে একটি ভূমিকায় লেখক আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পরে মূলগ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে। সতর্ক শিল্পীর মতো রচনাটিকে চারখন্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ অংকুরখন্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের পল্লব, কুসুমখন্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের কুসুম', ফলখন্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের ফল'। উপসংহার হিসেব ত্রিপদী ছন্দে 'অথ জ্ঞান উপদেশ' শীর্ষক একটি পদ্যযুক্ত হয়েছে। খন্ড গুলি আবার 'অথমুন্সী বৃত্তান্ত', 'অথ স্কুল মেস্টরের বৃত্তান্ত এ রূপ শিরোনামাংকিত পরিচ্ছেদ বিভক্ত । লেখক বেশ সুশৃংখলভাবে প্রসঙ্গগুলি সাজিয়েছেন।" (ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃঃ৭৮)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সব বাঙালী ইংরেজের অধীনে চাকুরী ব্যবসা করে হঠাৎ প্রভুত অর্থের উপার্জনকারী হিসেবে সমাজে নূতন ধনশালী রূপে আবির্ভূত হন সেই হঠাৎ বড়লোক পুত্রের কথা এ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এ সব ধনী সম্প্রদায় কি উপায়ে ধনবান ব্যক্তিতে পরিণত হয় তার ব্যঙ্গাত্মক চিত্র প্রথম খন্ডে বিবৃত।

বিশেষত আধুনিক কাল্পনিক বাবুদের পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলকাতা এসে স্বর্ণকার, বর্ণকার, চর্মকার প্রভৃতি কাজে বেতন ভোগ করে কিংবা সর্দারী, চকিদারী, জোয়াচুরি, পোদ্দারী অথবা মিথ্যাবচন হারামী কিংবা বেশ্যার দালাল হিসেবে অথবা পৌরহিত্যের ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে কোম্পানীর াগজ কিংবা জমিদারী করার মাধ্যমে রাতারাতি ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এ শ্রেণীর পুত্রদের ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"ইংরেজী ভাষাতে কোন লোক জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্তর করেন, যথা তোমার পিতার নাম কি, টোটারম ডট্ট অর্থাৎ তোতারাম দও।" (ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃঃ ৭৯)

এই নববাবুদের পরিচয় দালালের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মহাজনের কাছে দালাল বলেছে এই বাবুদের নাম জগৎ দুর্লভ বাবু, পিতার নাম 'রামগঙ্গা নাগ। এ বাবুর হরেক রকম সদাগরী আছে বেলেঘাটায় চুনেগোলা, জকসনের ঘাটে মল্যার দোকান, খাতাকাটিতে মুটের সরদারি প্রভৃতিতে প্রায় দু'লক্ষ টাকা পুঁজি। মহাজন এই নববাবুর পরিচয়ের সত্যতা স্বীকার করেন।

ভবানীচরণ বাবুদের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণে শিক্ষা ব্যবসায়ী ও তৎকালীন বাংলা, ফার্সি ও ইংরেজী শিক্ষার প্রণালীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতে তাঁর বিদ্রূপের তীব্র রং লক্ষ করা যায়।

নববাবুদের বিদ্যাঅর্জনের বিবরণে তাদের কর্তা ব্যক্তিদের শিথিল সামাজিক শাসন চিহ্নিত হয়েছে অর্থাৎ অনেক চেষ্টায় তাদের বিদ্যাঅর্জন শূন্যের কোটায়। বিবেচনা শূন্য, রুচিহীন নীতিভ্রষ্ট এসব বাবুদের চতুর খোসামুদের খলিফা ও দালাল ও মহাজনদের প্ররোচনায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, বিবেচনা শূন্য।

"চতুর খোসামুদে খলিফার বাক্যচছটায় যে মুগ্ন প্রাণ হিতাহিত বিবেচনা শূন্য। মহাজনের কাছে ঋণ করে বেশ্যাসঙ্গ মদোৎসব ও সংশ্লিষ্ট বিচিত্র আমোদ যে আপনাকে ভাসিয়ে দেয়। দালালেরা যে তাকে 'অভাগা অঙ্গ' বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। দু'হাজার টাকার মত সই করে যে পাঁচশ টাকা কর্জ নিল এবং প্রমোদের এক বিপুল আয়োজন ফাঁদল। এখানে বারাঙ্গনা বিলাস এবং পানভোগের বিচিত্র মজার এক দীর্ঘ বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন।" (ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃঃ ৮০)

Dhaka University Institutional Repository

বাবুদের আমোদ মত্ততার বিবরণ এবং তাদের পানাসক্তি ও অসঙ্গত আচরণ এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য দিক। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নায়ক নববাবুর নির্বুদ্ধিতা মিথ্যা গৌরব জাহির করার প্রবণতা, অকর্মণ্য প্রভৃতি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

বিবিধ ব্যবসায় নববাবুর অর্থ বিনষ্টির কারণ বর্ণনা এবং এ সূত্রে অন্তঃপুরের রমণীদের চতুরতা বর্ণিত হয়েছে। অর্থের জন্য বাবু তার স্ত্রীর কাছে পাঁচনরী হার ধার চাইলে তার স্ত্রী তাকে তার অবৈধ সম্পর্ক বিষয়ে কোন কথা উচ্চারণ না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। নববাবুর নীচতা ও হীনমন্যতা প্রকাশিত।

নববাবুবিলাসের উপসংহারে দেনার দায়ে বাবুর কয়েদ খাটা ও পরবর্তী সময়ে কর্তার দ্বারা মুক্তি লাভ করা এবং মুক্তি লাভের পর মুহূর্তে বেশ্যালয়ে গমন এবং অর্থাভাবে সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়া ও পরিশেষে পিতার মৃত্যুর পরে সঞ্চিত সম্পত্তি দিয়ে বাড়ি তৈরী করার পর নিঃস্ব হওয়া এবং আপন ঔরসজাত সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও পাঁচকন্যার বিবাহে সর্বস্বান্ত হওয়ার বিবরণ লেখকের বিদ্রূপ দৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে।

রামগঙ্গা নববাবুর কর্তা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার বিস্তর আয়োজন করলেও সর্বাংশে ব্যর্থ হয়। বরং পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ পুত্রের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায় । এই রামগঙ্গা তোষামদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে আনন্দ বোধ করে। ব্যবসা ও ঘটের সর্দারি করে সে বড়লোক হয়েছে। তার পুত্রকে খলিপা অভিধাযুক্ত সুরবাবু লাম্পট্যের পথে সর্বস্ব হারানোর কাজে প্ররোচিত করেছে। এই খলিপা কলকাতার বহু নববাবুকে বাবুগিরি শিখিয়ে এবং প্রাচীন বাবুদের সাহচর্যে থেকে খলিপা নাম পেয়েছে। কিন্তু বিকৃত জীবনের অসাধু ইন্দ্রিয় প্রয়োগে সে নববাবুর জীবনে এনেছে মর্মান্তিক পরিণতি।

Dhaka University Institutional Repository

'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে বৃদ্ধা বেশ্যাদের এবং কলকাতা শহরের বিবিদের আহার বিহারের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা কৌতুককর।

(ক) ''তৎপরে পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা রতিপন্ডিত বহুমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড় নিতম্বিনী বারাঙ্গনা প্রাধানা বকনাপেয়ারি ফোঁকড়া পেয়ারী দামড়াগোপী কানঝাড়া রাধামনি ছাড়ুখাগি মনি জয়াবিবি প্রভৃতি আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকরি সঙ্গে লইয়া খলিপা সমভিব্যাহারে বাগানে আগমন করিলেন।'' (নববাবুবিলাস, পৃ ঃ ৩৩)

(খ) ''কেহ কহে কালিয়া কাবাব, কেহ বলে লালসরাব, কেহ বলে আচছা বেরান্ডী, কেহ বলে ফাইন ব্রান্ডি, কেহ বলে এখনি পোলাও, কেহ বলে তবল বাজাও, কেহ বলে বহুত মজা, কেহ বলে, খেমটা বাজা, কেহ বলে মোহন গাঁজা, কেহ বলে ফের লেগে যা, কেহ বলে সরস চরস, কেহ বলে আঙ্গুরকা রস।''

(নববাবুবিলাস, পৃঃ ৬২)

''নববিবিবিলাস''

নববাবুবিলাসের মত নববিবিবিলাসও কলকাতা নগরের সমাজ বাস্তবতার চিত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য । এ গ্রন্থে ভদ্র কুলবধূদের বেশ্যাসক্তি অবলম্বন করে সামাজিক জীবনে তাদের দুর্গতির ব্যঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে। 'নববাবু বিলাসে' নববাবুদের বেশ্যা গৃহে গমন ও পরস্ত্রীতে আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় · হঠাৎ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাবু সম্প্রদায়ের জীবনে ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে বিবিদের ভ্রষ্টা হওয়ার কাহিনী এ গ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি অংকুর খণ্ড, পল্লবখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড এ চার খন্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডে কত গুলো শিরোনাম যুক্ত পরিচ্ছেদ রয়েছে। আবার প্রতিটি খন্ডে পয়ার, ত্রিপদীতে লেখা পদ্যও আছে। দীর্ঘগদ্য রচনার এক ঘেয়েমী দূর করার জন্য লেখক গদ্যের মাঝে পদ্যের সুর সংযোজন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে জনৈক বাবুর স্ত্রী এক নাপিতিনীর কুমন্ত্রণায় কিভাবে গৃহ ত্যাগ করে পল্লী গ্রামের লম্পট বাবুর সঙ্গে প্রণয় বিস্তার করতে গিয়ে চকিদারের হস্তক্ষেপে তিনজনই শ্রীঘরের বাসিন্দা হয়ে পরবর্তী সময়ে নাপিতিনী ব্যতীত নায়ক নায়িকা ছাড়া পেল তার মধ্য দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত। কিন্তু কলংক বধূ মুক্তি পেয়ে দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘরে আশ্রয়ের সন্ধানে না গিয়ে আশ্রয় নিল জনৈকা প্রাচীনার বেশ্যাগৃহে। এই প্রাচীনাকে মা সম্বোধন করায় সে নববিবি হিসেবে আখ্যা পেল। প্রাচীনার যাবতীয় ব্যবস্থায় নববিবি বারবনিতার প্রয়োজনীয় দীক্ষা গ্রহণ করে এক সময় একজন উপযুক্ত নায়কের রক্ষিতা হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। নববিবির প্রেমের অভিনয় এবং নববাবুর আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য পূঁজা উপলক্ষে শহরে প্রাচীন ও সুপরিচিত উচ্ছৃংখলবাবুদের খেমটা নাচের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরিণতিতে বাবু আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত হয়। এ সময় এক ডাকওয়ালার সাথে শুরু হয় বিবির গোপনে প্রণয় এবং বাবুকে ছেড়ে বিবি কণ্ঠলগ্ন হয় সেই ডাকওয়ালার । ডাকওয়ালার প্রেমে ও ছলনায় ভুলে নববিবি নিশ্চিত উপার্জন হারায় এবং প্রতারক ডাকওয়ালা এক সময় তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। নববিবি এর পর বাজারের সাধারণ বারবনিতার মত কুলিমজুরদের সাথে থেকেও বেশীদিন চলতে পারলো না। দাসীবৃত্তি করাও তার চরিত্র দোষের জন্য সম্ভব হল না। আবার বাবুদের হয়ে দূতিগিরি গ্রহণ করতে গিয়ে তার কপালে ঘটলো হাজত বাস। জনৈক বাবুর সাহায্যে মুক্তি পেয়ে শেষ পর্যন্ত সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হল। মূলত, সমাজের নীচ তলার নিন্দিত জীবনের গ্লানিকর দিকগুলো এ গ্রন্থে উন্মোচিত হয়েছে। যুবতীকুলবধূ স্বামীর অবহেলায় প্রতিকূল পরিবেশে এ অবস্থার শিকার হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"উনিশ শতকের গোড়ায় সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে, নারীর মর্যাদা বলে কিছু ছিলোনা, নাগরিক জীবনে ধনস্ফীতির আকস্মিক প্রকোপতায় তা আরো জটিল রূপ ধারণ করে কৌলীণ্যের অনাচার, বিধবা বিবাহের অস্বীকৃতি অসহায় নারীকে বেশ্যাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে ; কিন্তু ভদ্র কুলবধূও যে বেহায় তারই নিদর্শন নক্শার রাজ্যে প্রদর্শিত। সমাজের এই বিশেষ সত্যের উদ্ঘাটনে 'নববিবি বিলাস' এর কিঞ্চিৎ মর্যাদা প্রাপ্য।" (চৌধুরী, ১৯৮২, পৃঃ ২৭৬)

'নববিবিবিলাস' গ্রন্থে বেশ্যা সমাজের রীতিনীতির কথা বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৮৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে নৃত্যগীত শিক্ষার বিবরণ ১৫ পৃষ্ঠায় বৃত্তির নানা কৌশল, পোশাকাদির বর্ণনা; বাবুদিগের বশ করার নানা ঢঙ, বিহারের রীতি, কপট প্রেমের উপদেশ প্রভৃতি পনর পৃষ্ঠা, দেড় পৃষ্ঠা ধরে বসন্তরাজার পূজার বেহেল্লপনার ছবি।

মূলত বেশ্যাপল্লীর সাংস্কৃতিক পরিবেশের চিত্রে বাস্তববোধের সঙ্গে লেখকের ব্যঙ্গ দৃষ্টি সক্রিয় ছিল। নববিবিকে গান বাজনার তামিল দেওয়া সম্পর্কে যে বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে তাতে ব্যঙ্গের সুরটি স্পষ্ট। কলকাতা শহরের চাকুরী প্রত্যাশী গায়কদের এক একজনের পরিচয় এই ব্যঙ্গচিত্রে উন্মোচিত হয়েছে।

"একজন বাঙাল রামমানিক্য যার আত্মপরিচয় ঃ আমার গো বাড়ী ডাহার ইছলাপুর' (পৃ ঃ২৭)। দ্বিতীয় ব্যক্তি তো পীরের গীতই আরম্ভ করেছিলো ঃ ' সত্যপীর সত্যপীর ছেঁড়া কাঁথা গায়। ও পারেতে সত্যপীর পলাইয়া যায়।" (পৃঃ২৮)। তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় ঃ পশ্চিম দেশীয় চন্দ্র কোনাবাসী নিকট লম্পট কপট ব্রাহ্মণ-------। গায়ক ও পাচক দুই কর্ম্মই করিতে পারিবেক' (পৃ ঃ ২৮-২৯) । চতুর্থ ব্যক্তির পরিচয়টি আরো মজার-----। সাহেব লোকের বাড়ীতে সর্দারী কর্ম্ম করিয়াছি, সবর্বশেষে কিঞ্চিৎ দ্রব্য চৌর্য্যকরণ

Dhaka University Institutional Repository

হেতু' সাহেব বেত্রদন্ডসহ বিদায় করেছে তাকে। এই চারজনের পরীক্ষা নেওয়ার কালে বৃদ্ধ বীতস্পৃহ হয়ে সবাইকে বিদায় করে 'অনাহত বরাহত' একজনকে নির্বাচন করলো এবং 'গায়কের সহিত মহিয়ানা স্থিত করিয়া আর ২ কর্ম্ম কার্য্যের বৃত্তান্ত তাহাকে কহিয়া চাকর রাখিলেন।' (চৌধুরী, ১৯৮২ , পৃ ঃ ২৭৯)

এ ছাড়া নৃত্যগীতির বিবরণে কৌতুক রস ও ব্যঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রকাশিত।

নানাবিধ ছলাকলা ও প্রতারণার বিবরণে রঙ্গ ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়, ছলনা, ছেনছি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেড়েমি প্রভৃতির বিবরণ ও তাদের সাজ-সজ্জা বেশ্যাপল্লীর অনিবার্য উপকরণ হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত। কৌতুকদীপ্ত ও প্রাণবন্ত ভাষা প্রয়োগে ভবানীচরণ গ্রন্থের কাহিনীর সূক্ষ্ম রূপদান করেছেন . লেখকের ভাষায়.

"------নববিবিদিগের যে পতি হয় অবিকল সেই সকল সংগ্রহ করিলাম, ইহা বাস্তবিক বাবুজনের হাস্য পরিহাস্যের নিমিত্ত রহস্যস্বরূপ হইবে-----।" (চৌধুরী, ১৯৮২, পৃঃ ২৮৮)

একারণে গায়কের স্বভাব বর্ণনায় বা গীত শিক্ষকের পরিচয় বর্ণনায় লেখকের রসালো বাক্যের নিদর্শন নিম্নরূপ ঃ

"হাপকাটা গায়কবেটা, অতি ঠেঁটা, বাক্যে জেঠা কর্মে খোঁটা, বুদ্ধি মোটা, টিকি কাটা, গোঁফ ছাঁটা, কথা ঝুটা, নজর ছোটা, পাতড়া চাটা, সর্বদাগীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্য গমনে অপেয়পানে মূর্ত্তিমন্ত এক অধম, নীচকর্ম তাহার স্বধর্ম, চুরি জয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়, কিন্তু আপন বিষয় ভোলে না, তত্ত্বকথা ছাড়া না।" (নববিবি বিলাস, পৃ, ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

নববিবির কলংকময় জীবনের নানা পর্যায়ের বর্ণনা লেখক কখনো তার প্রেমের অভিনয়, কখনো প্রতারণার সূত্রে আবার কখনো বা ব্যর্থ জীবনের কাহিনীতে নৈতিক আদর্শের সংস্কার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে সামাজিক নক্শায় তিনি ধারণ করতে চেয়েছেন ক্রমবিকশিত সমাজের আন্তঃ অসঙ্গতি। ঠাট্টা বিদ্রূপ ব্যঙ্গের স্বচ্ছন্দ বুনুনিতে কলকাতা নগরীর ক্লেদাক্ত জীবন লেখক অসামান্য নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

বস্তুত ভবানীচরণ যুগ সংক্রান্তির কালে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে কলকাতা নগরীর রূপ অংকনে যেমন পারঙ্গম তেমনি নগর জীবনের বাবুর কাহিনী ও বিবিদের করুণ কাহিনীর ইতিবৃত্ত রচনায় সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

লেখক পরিবর্তিত সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা নক্শা হিসেবে সাধারণ ভাবে সামাজিক অবস্থার বিবরণের প্রমাণপত্রের রূপে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

প্যারীচাঁদ মিত্র

হাস্যকৌতুক সমন্বিত, সমাজ সমালোচনা মূলক বস্তুনিষ্ঠ রচনা প্রায়সকে যদি অভিহিত করা হয় নক্শা হিসেবে, তাহলে প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত সমকালীন সমাজের বিশ্বস্ত নক্শা চিত্র ''মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়''কে অভিহিত করা যেতে পারে এ ধারার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসেবে । প্যারীচাঁদ মিত্র ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ইয়ংবেঙ্গলের মত উগ্র স্বভাবের কিংবা উচ্ছৃংখলতার বিরোধী ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল পরিমন্ডলে অবস্থান করে এবং রামমোহনের আদর্শ গ্রহণে তিনি যে মুক্ত দৃষ্টি ও কর্ম উদ্যম জীবন দৃষ্টি গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনটি অত্যধিক অসংযমের পক্ষপাতি ছিল না। বিশেষত প্রথাগত ধর্ম, সংস্কার জীবনাচরণের বিরোধী ছিল ইয়ংবেঙ্গলরা। কিন্তু রক্ষণশীল মনোভাবকে বর্জন করতে গিয়ে তাদের আচরণে আত্মপ্রকাশ করে নানাবিধ উচ্ছৃংখলতা । প্যারীচাঁদ সমাজ সচেতন লেখক হিসেবে এই ধরনের আতিশয্য কিংবা অসংযমকে প্রশ্রয় দেননি। বরং নির্মোহ দৃষ্টিতে মদ্যপান ও মদ্যপানের উচ্ছৃংখল আচরণের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন । খন্ড খন্ড চিত্রের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন সমকালীন সমাজ জীবনের নানা অসঙ্গতি।

'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' নক্শা রচনার নিম্নলিখিত অংশ

১। ''মদ খাওয়া বাড়িতেছে- ''মাতাল নানারূপী''

২। ''মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে''

৩। ''নেশাতেই সর্ব্বনাশ''

৪। ''জাতি মারিবার মন্ত্রণা''

৫। ''জাতি রক্ষার্থ সভা''

Dhaka University Institutional Repository

৬। ''জাতি মারিবার বাসি মন্ত্রণা''

৭। ''গরু কেটে জুতা দান''

৮। ''কি আজব দেখিলাম শহর কলিকাতায়''

৯। ''অতিলোভে তাঁতি নষ্ট''

১০। ''বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার''

লেখক উদ্দেশ্য প্রণোদিত রূপে অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঘটনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। রচনায় যে কাহিনী স্থান পেয়েছে তাতেও সমকালীন সামাজিক ব্যাধিসমূহ উন্মোচন ও নিবারণের প্রচেষ্টা অভিব্যক্ত।

''আলালের ঘরের দুলাল'' গ্রন্থটি পাঠক আদৃত হওয়ার পর প্যারীচাঁদ মিত্র বহুলাংশে উৎসাহিত হয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থটি রচনায় আত্মনিবেশ করতে। ''আলালের ঘরের দুলালে'' প্যারীচাঁদ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তারই সফল সমাজ চিত্রণ রূপে ''মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'' রচনাটির সৃষ্টি।

'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থটি দুটি খন্ডে বিভক্ত । প্রথম খন্ডের মদ্যপানের ক্রমবিস্তারি প্রথার ও বিচিত্র মাতালের নক্শা লেখক কখনও খন্ড ঘটনা আবার কখনও পূর্ণকাহিনীতে পরিস্ফুট করেছেন।

প্রথম খন্ডে ভবানীপুরের ভবানীবাবুর মদে মত্ত হওয়ার পরিণতিতে করুণ কাহিনীর সৃষ্টির বিবরণ লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে জয়হরি বাবুর নেশাসক্তির ফলে যে সর্বনাশা পরিস্থিতির উদ্ভব তারও অনুপুঙ্খ প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হয়েছে ব্যঙ্গ রচনায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় খন্ডে- ''আগরভম সেনের কৌতুকাবহ চরিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রণই উহার ঔপন্যাসিক ধর্মের প্রধান ও একমাত্র নিদর্শন। যে পক্ষিনাম ধারী উৎকট নেশাখোরদলের দলপতি রূপে 'পক্ষিরাজ' অভিধায় পরিচিত। তাহাদের নেশার ও নেশার ঝোঁকে উদ্‌ভ্রান্ত স্ফূর্তি আমোদ ও সঙ্গীত চর্চ্চার উপভোগ্য ব্যঙ্গচিত্র দেওয়া হইয়াছে।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, ভারতীয় লাইব্রেরী, ১৩৬৭, পৃ ঃ ২৮)

প্রথম খন্ডে মদ্যপানের ক্রমবিস্তার ও বিচিত্র মাতালের হাস্যকর ও অদ্ভুত আচরণ বর্ণিত হয়েছে মাতালদের মদমত্ত হয়ে অসঙ্গত আচরণের মধ্য দিয়ে এ-অংশে লেখক মদ খাওয়ার কুফল উপস্থাপন করেছেন মদে মত্ত হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র ভবানীপুরের ভবানীবাবুর কাহিনীতে লিপিবদ্ধ । কলেজে অধ্যয়নের সময় সঙ্গ দোষে মদ্য পানে আসক্ত হয় ভবানীবাবু। এই ভয়ানক আসক্তি তারই স্ত্রী পুত্র ও পিতামাতার জন্য অনিবার্য শোকের কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র মদ খাওয়াকে একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে ভবানীবাবুর করুণ পরিণতি তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে জয়হরি বাবুর বৃত্তান্তে লেখক "নেশাতেই সর্ব্বনাশ" এই উপদেশ বাণী প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম খন্ডে মদ্যপানের প্রথার ও মাতালদের বিভিন্ন আচরণসমূহ প্যারীচাঁদ মিত্র কৌতুককর ঘটনাদৃশ্যে ও ব্যঙ্গবাণে চিত্রিত করেছেন যেমন ভবানীবাবুর মদ্যাসক্তি বর্ণনায় লেখকের হাস্যরসের সৃষ্টি লক্ষযোগ্য।

"ভবানীবাবুর ক্রমে ক্রমে সুখ ইচ্ছা হইতে লাগিল। অতি শীঘ্র কলেজকে জলাঞ্জলি দিয়া বাটীতে বসিয়া সংক্ষিপ্ত নিরবচ্ছিন্ন মদে মত্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পেয়ালা বাজাতে পেকে গেলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাতে কখনই বোতল ছাড়া নাই, কেবল মদের কথা-মদের চর্চ্চা-মদের আলাপ মদের প্রশংসা । মদেতে যে যে দোষ ঘটে-তাহা সকলই ঘটিল। পরিবারের প্রতিও স্নেহ কম হইতে লাগিল-মায়ের কাছে বসা নাই-স্ত্রী সুখ দেখা নাই- সন্তানাদির তত্ত্ব করা নাই-রাতি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত দশ জন মাতাল বৈঠক খানায় কেবল গোলমাল করেন। কেহ কাঁদেন-কেহ হাসেন, কেহ চীৎকার করেন, কেহ গান

Dhaka University Institutional Repository

গান, কেহ ঢাক পেটেন, কেহ নাচেন, কেহ গালি দেন, কেহ মারেন, কেহ ডিগ্‌বাজি খান। বাটীতে এমনি শোর শরাবত হইতে লাগিল যে, পাড়ায় নেড়ি কুকুর ও চৌকিদার ভেগে গেল। সন্ধ্যার পর কার মাধ্যমে দিক্ দিয়া পথ চলে। যখন সকল অবতারগুলি একত্র হন, তখন এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে, বোধ হয় যেন, ইংরেজের কেল্লা গেল। এক দিক্ থেকে একজন ঠাকরুণ বিষয়ের চিতেন ধরেন, অমনি আর একজন তাঁহার সুখের কাছে হাত নেড়ে বিরহ গান, আর এক দিক্ থেকে একজন ধ্রুপদের আলাপ করেন, অমনি আর একজন তাঁহার ঘাড়ের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া মুখের সাম্‌নে মুখ রেখে গাধার ডাক ডাকেন। হয় তো কেহ উঠে মাথায় হাত দিয়া বাইনাচ নাচন-আবার অন্য একজন তাহাকে ঠেলে ফেলিয়া আড়খেমটা নৃত্য করেন। যে পর্য্যন্ত ঝিমকিনিভাবে থাকেন, যে পর্য্যন্ত কেহই স্থির নহেন। নেশাটি দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে কোন দিক্ থেকে কোন্ বীর কোথায় পড়ে যান, তার আর খোঁজ-খবর থাকে না"। (মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, পৃঃ ২০৩-২০৪)

লেখক দ্বিতীয় খন্ডের আগড়ভম সেনের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে নব্য সম্প্রদায়ের মদ্যপানের বিবরণ প্রদান করেছেন। বাবু সমাজের অমিতাচার, মদ্যপান ও উচ্ছৃংখল আচরণ তৎকালীন কলকাতা সমাজের ইংরেজ বাণিজ্য প্রসারের অনিবার্য বিষবৃক্ষ। বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রের বাঙালির ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যের বদৌলতে যে নব্য অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয় তাদেরই প্রতিনিধি আগড়ভম সেনের নেশার আড্ডাধারীরা পক্ষিদল এবং নিজে সে দলের পক্ষিরাজ। পক্ষীদলভুক্তরা সর্বদা আমোদ ও কৌতুকে দিনাতিপাত করতে অভ্যস্ত। এ কারণে তাদের দলনেতাকে নিয়ে কৌতুককর ঘটনা সৃষ্টি করেছেন। বিশেষত পক্ষিরাজের বিধবা বিবাহের বিষয়ে উৎসাহ এবং তারই ফলে তার দুর্গতি প্যারীচাঁদ মিত্র হাস্যরসে মন্ডিত করে বিবৃত করেছেন। কুসঙ্গ ও নেশার আসক্তি পক্ষীরাজের দুর্গতির অন্যতম কারণ। যে "বাল্যকালাবধি" নেশাখোর ও কুকর্ম্মে রত"। পক্ষীরাজের সঙ্গীরা ভুবনমোহনি নামক এক বিধবা নারীর স্বপ্নে পক্ষিরাজকে বিভ্রান্ত করে আমোদ লাভ করে। প্যারীচাঁদ পক্ষিরাজ ও পক্ষিসকলের বিবরণের

Dhaka University Institutional Repository

কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন। আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডঙ্কেশ্বর পক্ষিরাজের লাঞ্ছনায় আহলাদিত হলেও শেষ পর্যন্ত ডঙ্কেশ্বর ও ঘটকের যে পরিচয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাতে লেখক সঙ্গ দোষে ব্যক্তির এই ধরনের পরিণতির উদ্ভব হয় বলে মনে করেছেন। পক্ষিরাজের মেয়ে মানুষদের অদ্ভুত বেশ লেখকের কৌতুককর বিবরণে ধৃত হয়েছে-

''এদিকে বাগবাজারের নব্যদল মশাল জ্বালাইয়া নিশান তুলিয়া ঢোপ বাজাইতে বাজাইতে 'বৌ আনতে গেছে তারা ঘরে নাই গো' এই গান গাইতে গাইতে দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত-পক্ষিরাজ দেখিলেন বিপদ সমূহ-ঘটক মহাশয় চাপাহাসি বদনে গলা খাঁকানি দিয়া অগ্রবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'সেনজা মহাশয় ব্যাপারটা কি ? ওদিক থেকে ডঙ্কেশ্বর সকল পক্ষীকে লইয়া হা হা হাস্য করিতে করিতে বলিল, একি মহাদেবের মোহিনী বেশ নাকি ? বাবু ডুবে ডুবে খুব জল খেলে, এখন যাদের মড়া, তাদের কাছে এস' এই বলিয়া পক্ষিরাজের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎ থেকে দূত্তর গরবা হাত তালির চোট ঢোলের চাটি ও গানের গলাবাজিতে চতুর্দিক কম্পমান হইতে লাগিলে, ঘটক দৌড় আসিয়া জিজ্ঞাস করিলেন তবে লগ্নপত্র কি কাকা হবে ? ডঙ্কেশ্বর বলিলেন, ''একেবারে কলসী, কাচা ধঞ্চে ও সুঁদারি কাষ্ঠের সহিত হরে।''(মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'' পৃ ঃ ২২৫-২২৬)

প্যারীচাঁদ মিত্র আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের 'জাতিমারিবার মন্ত্রণা' 'জাতি রক্ষার্থ সভা' ও জাতি মারিবার বাসি মন্ত্রণা, 'গরু কেটে জুতাদান' কি আজব দেখিলাম শহর কলিকাতায়, অতিলোভে তাঁতি নষ্ট, 'বাইরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতো শ্যাম অবতার' প্রভৃতি অংশে সমাজ সতর্ক দৃষ্টি উচ্ছৃংখল ভণ্ড ও অনাচার লিপ্ত মানুষের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। বিশেষত গোপনে ও অন্তরালে সমাজ বিরোধী ও অনাচারে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ কিভাবে প্রকাশ্যে অন্যান্য অনাচারকারীদের বিচারে ও মন্ত্রণায় নিয়োজিত হয় তারই ব্যঙ্গচিত্র প্যারীচাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

লেখনীতে উপস্থাপিত হয়েছে। জাত রক্ষার্থে লোক দেখানো ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা কিভাবে হরিনাথ দত্তের শাস্তি বিধানের উদ্যোগী হয় তার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

" বাচস্পতি। কুক্কুটে মাংস অতি উপাদেয় । মনুবিধিদেন সে বনকুক্কুট আমাদের খাদ্য। পূর্বে ঋষিরা গোমেধ করিতেন বরাহের মাংসাদিতে শ্রদ্ধাদি সম্পন্ন হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদিগের উদরস্থ হইত, তবে দ্বিপদ পক্ষী এক্ষণে কেন খাদ্য হইবে? ভবশংকর। বাচস্পতি দাদা, একটু পায়ের ধূলা দেও- তুমি শান্ত কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি। গোস্বামী । আমি আর একটু মদ্যপান করিব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদ্যপান করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছ না। হানিপে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। যে দিবস উইলসনের হোটেলে সে মাংস খাইয়াছিলাম যে বড় উপাদেয়।" (মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় , পৃ ঃ ২২৯)

মূলত জাতিভেদ সংক্রান্ত দাম্ভিকতা ও পারস্পরিক কোন্দল 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা' ও অন্যান্য অংশে উপস্থাপিত হয়েছে । 'জাতি মারিবার মন্ত্রণায়' ভবশংকর বাড়ির বৈঠকখানায় শনিবার সন্ধ্যায় তার পরিষদ প্রেমচাঁদ দত্ত, দিগম্বর বাচস্পতি ও হলধর গোস্বামী হানিপের আনীত নানা রকম মাংসের কাবাব ব্যঞ্জন পোলাও, রুটি প্রভৃতির সঙ্গে মদ্য পানে মত্ত হওয়ার সময় উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশের কথোপকথনে চরিত্রগুলো হিন্দুয়ানির নামে মিথ্যাচারের বিদ্রূপাত্মক নক্শা রূপায়িত হয়েছে। এই অংশে বাচস্পতিদের মিথ্যাচার অনাচারে ও আচার সর্বস্ব হিন্দুয়ানির আস্ফালনের বিপরীতে হরিনাথ সংস্কার শূন্য আধুনিক মুক্তমনের ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া লেখক মদ্যপানে মত্ত বাচস্পতির অবস্থার বর্ণনায় কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আচার সর্বস্ব হিন্দুধর্মের বিচিত্র সংস্কার সমাজ প্রগতির প্রধান অন্তরায় রূপে রামমোহন রায় চিহ্নিত করেন। এই উপলক্ষে তাঁর প্রতিষ্ঠিত " ব্রহ্মসভা" প্রথাগত হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতায় বিরুদ্ধাচারণ করে। রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও মুক্ত দৃষ্টির বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ সংঘবদ্ধ হয়ে 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার নতুন অভিজাত ধনী সম্প্রদায় ব্যক্তিবর্গ 'ধর্মসভার' নেতৃত্বে ছিল।

"প্রাচীন প্রথা, পরম্পরাগত সংস্কার বিশ্বাস শাসিত বদ্ধ সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতায় রামমোহন" অনুগামীদের হিন্দু সমাজের প্রথাবিরোধী আচরণের দন্ডদানের জন্য সমাজচ্যুত বা এক ঘরে করার সেই সনাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। হিন্দু সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্যের পরিবর্তে হিন্দুধর্মকে গ্রহণ বা ব্যাখ্যার অধিকার যে কোন ব্যক্তির থাকতে পারে, তাঁদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। ভারতবর্ষে এতাবৎকাল যে ধরনের রাষ্ট্রশাসন চলে আসছিল তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার প্রবর্তনে এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অভিযানে কলকাতার হিন্দু সমাজে যে পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকে ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য রূপে অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেননি। " (নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত- ১৯৮৯, পৃ ঃ ৮৮)

'জাতি রক্ষর্থ সভা'- অংশে প্যারীচাঁদ মিত্র ভবশংকর বাবুর বাড়িতে জাতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আয়োজিত মহাসভার বিবরণে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে যে শর নিক্ষেপ করেছেন তা মূলত তৎকালীন 'ধর্মসভার' দলাদলি ও শাস্ত্র সর্বস্ব পন্ডিতদের জাত রক্ষার্থের বিচিত্র আচরণের বিবরণ বিবৃত হয়েছে। ভবশংকর বাবুর বৈঠকখানায় ইংরেজীয়ানা সাজ তার হিন্দুয়ানির পবিত্রতা রক্ষার জন্য আয়োজিত মহাসভার বিপরীতে বিদ্রূপাত্মক দৃশ্যের অবতারণা। এমনকি এই সভায় আমন্ত্রিত উমাশংকর, কালীশংকর, তারিণীশংকর, রামশংকর, হরিশংকর প্রভৃতি বাবুর সভায় যোগদানের অপারগতার কারণ বর্ণনায় লেখক সমাজ নেতাদের মিথ্যাচার

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতিপরায়ণতা ও সমকালীন ব্যাধিসমূহের আক্রান্তের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যেমন হরিশংকর বাবুর মহাসভায় যোগদানের অপরাগতার কারণ নিম্নরূপ ঃ-

"তাহার বাটীতে সাহেব সুভোদিগের একটা খানা আছে, আর তিনি নেশা করিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন।" (মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় পৃ ঃ ২৩২)

ভবশংকরের মন্তব্য অনুসারে হরিনাথ দত্ত সর্ব প্রকারে উত্তম লোক শিষ্ট, শান্ত, নম্র, সরল, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, সৎ এবং পরোপকারী কিন্তু তার আপরাধ 'হিন্দু কুলোদ্ভব' হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে অন্ন গ্রহণ। এ কারণে তার বোনের বিবাহে যোগদানকারী এবং হরিনাথ দত্ত সমাজ চ্যুত হওয়ার অপরাধে অপরাধী । নৈতিকতা বোধ বর্জিত হিন্দুয়ানি রক্ষাকর্তাদের পুরাণ, গীতা প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্রের অবলম্বনে যুক্তি হল-

"বড় মানুষে গোপনে কে কি করে তাহার নিকাশ লইবার আবশ্যক কি ? হরিনাথ দত্তের ন্যায় প্রকাশ্যেরূপে হিন্দুয়ানির ঘাতক কর্ম কে করে ?'

("মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় পৃ ঃ ২৩৫)

কলকাতার অধিকাংশ গৃহে যেখানে মদ্যপান ও ইংরেজ সাহচর্য্য একটি সাধারণ ঘটনা সেখানে হরিনাথ দত্তের অপরাধ সম্পর্কে উক্ত সভার স্পট বক্তা হেমচন্দ্র বিদ্রূপের পরোক্ষ বিন্যাসে বলেছেন-

"তা বটে- এক্ষণে হিন্দুয়ানির মাহাত্ম্য বুঝিলাম। লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই প্রকাশ্যরূপে খাইলেই পাপ। কপটতা পূজ্য সরলতা নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফ্রেবি, জুলুমজাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রী হরণ এ সকল কুকর্ম

Dhaka University Institutional Repository

বলিয়া কর্তব্য নয়- এ সব কর্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না-চমৎকার বিধি ! চমৎকার শাসন । ভদ্রলোকে অভদ্র করিলে ভদ্র সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। তোমরা যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করিবে, দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীর আহার ও মদ্যপানে উন্মত্ত হইবে- তাহাতে দোষ নাই- তাহাতে অধর্ম্ম নাই, কিন্তু অন্য কেহ দ্বার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিত রূপে করিলে জাতি চ্যুত হইবে, এ রোগের ঔষধ কি? ''

("মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়", পৃ-২৩৫-২৩৬)

''জাতি মারিবার মাসি মন্ত্রণা''য় হেমচন্দ্রের বিরোধিতা ভবশংকর ও তার পরিষদের পুনরায় মদ্যপান ও অদ্ভুত আমোদের বিবরণ; 'গরু কেটে জুতা দান' শীর্ষক অংশে প্রথাগত হিন্দুয়ানি ও বিষয়ী নীতিবোধ বিবর্জিত ফরিদপুরের রামলাল ঘোষ সমাজ প্রগতি পরিপন্থী কর্মকান্ডের আলোকে প্যারীচাঁদ মিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন সমকালীন গৃহস্থ জন-জীবনের দুর্নীতি, পরস্ব সম্পদের অপহরণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লোক দেখানো ধর্মীয় আচার প্রভৃতির কৌতুককর দৃষ্টান্ত । এ জন্য কলেজের পন্ডিত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, টোলের পন্ডিত হলধর তর্কালংকার রামলালের প্রশস্তির বিরুদ্ধে বলেছেন-

''তিনি কত কত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, আর বল ও ছল পূর্ব্বক কত কত ভদ্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন। এই সকল মহাপাপ করিয়া কেবল নাম কিনিবার জন্য শ্রাদ্ধ ও পূজায় দান করিলে কি পার পাইবেন ? যে কেবল গরু কেটে জুতা দান

''(মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, পৃ ঃ ২৪০)

'কি আজব দেখিলাম শহর কলিকাতায়' অংশে উত্তম পুরুষের জবানীতে ও একজন ব্রাহ্মণের স্বপ্ন দর্শনে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বিচিত্র অসঙ্গতির বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এ শহরের দলপতি বাবুরা রাত্রি যাপন করে মদ ও অস্পৃশ্য ও অশুচি খাদ্য গ্রহণ করে। সকালে স্বজাতীয় রীতি ব্যবহার ধর্মের বেহিসেবি

Dhaka University Institutional Repository

নিন্দা করার মাধ্যমে জাতিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয় । এমনকি বলরাম ও রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তানেরা শূদ্রের বাড়িতে জল স্পর্শ না করলেও বারবনিতার গৃহে খাদ্য গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। সুশিক্ষিত বাবুরা ইংরেজদের কৃপা দৃষ্টি লাভের জন্য বিজাতীয় ভড়ং এ মত্ত হয়। এ কলকাতা নগরী শঠতা ও অধর্মের সমুদ্র। স্বপ্নদ্রষ্টা কলকাতা নগরের বিভিন্ন দল উপদলের নেতাদের বিচিত্র কর্মযজ্ঞের হিন্দুগিরি ও হিন্দুজাতির ধর্মনাশের আখ্যান প্রাচীন যষ্টিদাড়ী ব্যক্তির দ্বারা উপলব্ধি করেছেন-

"যে গরুটা পালাই পালাই ডাক ছাড়ছে, ইহার নাম জাতি, এ অনেক চোট খাইতেছে আর টিকতে পারে না । তাহার লেজ ধরে যিনি টানছেন, উহার নাম হিন্দুগিরি। জাতি গেলে তার গুমর যাইবে, এ জন্য টানাটানি করিতেছেন। আর ঐ যে কন্যা এক একবার নামছেন ও উঠছেন। উহার নাম ধর্ম্ম । বঙ্গদেশে এত অধর্ম্ম যে, তিনি আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না । এই কারণে আমাকে আনুকল্য করিতেছেন।" (মদ খাওয়া বড় দায়, জাত যাবার কি উপায়, পৃ ঃ ২৪৩)

হিন্দু সমাজকে ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা থেকে যে অসঙ্গতির বীজ জন্ম লাভ করে তার দায়ভার রক্ষণশীল সমাজ দলপতিদের উপর বর্তায়। বিচ্ছৃংখল, কুসংস্কার ও কুপ্রথায় জর্জরিত পশ্চাৎপদ সমাজের বিপরীতে প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রগতির পরিপোষকতা লক্ষণীয়- 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ঠ', 'বাইরে গৌরাঙ্গ-অন্তরেতে শ্যাম অবতার' অধ্যায়দ্বয়ে।

প্রথম থেকে নব্যশিক্ষিত বাঙালির ইংরেজ সান্নিধ্যের কেরানীগিরির চেয়ে সওদাগরীর প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কলিকাতা নিবাসী অম্বিকাচরণ সওদাগরী কর্মে ধন উপার্জনে ব্যর্থ হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলে জাতি রক্ষার্থে সমাজপতিরা অম্বিকাবাবুকে সমাজচ্যুত করার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু 'দলোরার'

Dhaka University Institutional Repository

ভেতর জনৈক স্পষ্ট বক্তা ব্রাহ্মণ এর বিরোধিতা করেন। অন্যান্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তবু বিদেশ ভ্রমণে জাত যাওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই তারই বাস্তব সত্য এই অংশে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'বাইরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার' অংশে রামানন্দ ও ভজহরির চরিত্রের মাধ্যমে কৌলিণ্য প্রথার বিকৃতরূপ উন্মোচিত হয়েছে। কুলীণ বংশে জন্ম গ্রহণকারী রামানন্দ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধি ও বিষয় না থাকলেও কৌলিণ্যের গৌরবে গর্বিত ছিল। আত্মমান রক্ষার্থে জাত ও বংশ গৌরব রামানন্দকে ভন্ডামীর সঙ্গে ষন্ডামীর অবলম্বন করতে হয়। রামানন্দের প্রতিবেশী ভজহরি ঘোষ একই ভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধর্মাচারে আত্মনিবিষ্ট থাকলেও ''দুই জন জাতির টেক্কা কুলীন-দুই জনেরই জাত্যভিমান অসাধারণ-দুই জনেই কপট ভন্ড ও বিটল, দুই জনেই ধণলোভী -দুই জনেরই অর্থ উপার্জ্জনে ধর্ম্মা-ধর্ম্মজ্ঞান নাই, সুতরাং এত ঐক্যতায় আত্মীয়তা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। কি জালে, কি অপহরণে কি ফ্রেবে কি পরস্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করণে, কি মিথ্যা শপথ দেওয়াতে দুইজনেই বিলক্ষণ পটু, কিন্তু এমন বর্ণ চোরা আঁবের মত থাকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদিগেরও প্রতি কোন কোন দোষারোপ করে।''

(মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় পৃঃ ২৪৮)

কৌলিন্য গৌরব, বৈষ্ণবতন্ত্রের মাহাত্ম্য এবং বৈষয়িক ব্যাপারে আপাত দৃষ্টিতে অনাসক্তি উভয়ের চরিত্রে প্রকাশিত হলেও রামপ্রসাদ নামক ডোমের সুন্দরী বিধবা কন্যারও সর্বনাশে উদ্যত হলে রামপ্রসাদ তাদের শাস্তি বিধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের অগ্নিমূর্তি ও রাগান্বিত অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করে অবশেষে জাল মোকদ্দমায় তাদের 'বেনাকরি' প্রমাণ হওয়ায় তারা ধৃত হয়ে চালান হতে হয়। এভাবে লোকরক্ষার্থে ধর্মীয় আচার সংস্কার পালন করলেও অন্তরালে দুষ্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের লেখক অভিহিত করেছেন ''বাইরে গৌরাঙ্গ, 'অন্তরেতে শ্যাম অবতার'' রূপে।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালের সমাজ জীবনে দলীয় ব্যক্তির গোঁড়ামী, দুর্নীতি ও নৈতিকতাহীন উচ্ছৃংখল আচরণ এবং মদ্যপান ও হিন্দুয়ানির স্বপক্ষে ধর্মশাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় পন্ডিতদের মিথ্যাচার ভন্ডামী "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়"।

এ-গ্রন্থে লেখক ইয়ংবেঙ্গল পরিমন্ডল থেকে অর্জিত মুক্ত দৃষ্টি ও প্রগতিপন্থী সমাজ জীবনে মঙ্গলের অভিকাঙক্ষীত হয়েছেন। এ জন্য বাংলার সংস্কৃতির নব রূপ নির্মাণে তিনি কলম ধারণ করেন। জাতিসত্তা ও আত্মসত্তা অন্বেষণে লেখক যুক্তিবাদী ও মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি আধুনিক নাগরিক সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারের মানদন্ড চিহ্নিত করা সত্ত্বেও শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতে বিধবা বিবাহের মত সমাজ সংস্কারকে সফল করা সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে নারীদের শিক্ষাদান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর ছিল জোরালো সমর্থন। হিন্দু সমাজ ও তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে প্যারীচাঁদের চিন্তা ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। আপন সমাজের মঙ্গল চিন্তায় তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন নৈতিক আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের । এ জন্য মদ্যপান যেমন তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে নি তেমনি সমাজ সংস্কার বিরোধী আন্দোলন সমূহকে স্বীকৃতি দিতে চাননি।

প্যারীচাঁদ মিত্র মদ্যপানের ফলে সমাজে যে সংকট, সমস্যা ও দুরবস্থার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ পূর্বক কলকাতা নগরের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। গ্রন্থটির প্রথম তিনটি অধ্যায়ে জাতিভেদ নিয়ে অহংকার দলাদলি ও জাত মারার জটিলতার সৃষ্টি করা প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটি সমাজ সংস্কারের নৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রিত এই জন্য চরিত্র চিত্রণে বাস্তব জীবন কর্মকান্ডের বিবরণের সঙ্গে সমাজকে পর্যালোচনা করার দৃষ্টি সংযুক্ত হয়েছে। রঙ্গব্যঙ্গের আমেজে ও মেজাজে প্যারীচাঁদ কলকাতা নগরের মদ্যপানকারীদের চরিত্র অংকন করেছেন। মাতালদের মদ্যপান ও সুরাপানে মত্ত অবস্থায় ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত এবং প্রমত্ত আচরণ বর্ণিত হয়েছে প্রথম অংশে। অপরিচিত মদ্যপানের ফলে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার ঘটনা ভবানীপুরের ভবানীবাবু চরিত্র চিত্রণে লক্ষ করা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। উপদেশ আশ্রয়ী 'মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে' অধ্যায়ে মদ্যপায়ীর শোচণীয় পরিণতির সঙ্গে মদ্যপায়ীকে পর্যায়ক্রমে সুস্থ করার আদর্শগতদিক উন্মোচন করেছেন। বাঙালিদের ইংরেজীয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে ' নেশাতেই সর্ব্বনাশ' অংশে। নতুন শাসক ইংরেজদের মদ্যপানের রীতি অনুকরণ করতে গিয়ে সমাজ জীবনে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা জয়হরির চরিত্র রূপায়ণে প্রস্ফুটিত ইংরেজি আচরণ প্রকাশ করতে গিয়ে জয়হরি সদর দেওয়ানীর জর্জ সাহেবের দ্বারা বিদ্রূপবাণে অপদস্থ হয়েছে। কেবল ইংরেজি চলন ইংরেজী কথোপকথন ও ইংরেজি ভোজন প্রকৃত বিদ্যার্জনের মূলমন্ত্র নয় নক্শা আশ্রয়ী ব্যঙ্গবিদ্রূপে সে কথাই বলতে চেয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

দ্বিতীয় খন্ডে লাউসেনের পৌত্র আগড়ভম সেনের চরিত্রাঙ্কনে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আগড়ভম সেনের পাশে জয়হরির পানাসক্তি ও কুসঙ্গদোষে বিনষ্টির আলেখ্য রূপায়িত হয়েছে। মদ্যপায়ীদের উচ্ছৃঙ্খলে ও অশোভন আচরণ সমাজ জীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে তার স্বরূপ পক্ষিরাজ ও পক্ষিদলের চরিত্রবৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডের সূচনা অংশের আগড়ভম সেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের পর জয়হরির পক্ষিদলভুক্ত, হওয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

"পক্ষীদলভুক্ত হইয়া অবধি জয়হরি দিবারাত্রি আড্ডায় পড়িয়া থাকিতেন পরিবারের কিছুমাত্র তত্ত্বতাবায় লইতেন না আপন বিষয়-আশয়ের দেখাশুনা ক্রমে ঘুচিয়া গিয়াছিল কেবল অহরহ নেশা করিয়া ভোঁ হইয়া থাকিতেন। জয়হরি কিঞ্চিৎ ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিলে যে পরিস্কার বুদ্ধি ও দৃঢ়রূপে অভীষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণের ক্ষমতা হয়, এমত নহে, তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ ও অভ্যাসের আবশ্যক।" (মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" পৃঃ ২১৭)

Dhaka University Institutional Repository

আঠারো শতকের শেষ ভাগে কলকাতার ধনবান উচ্চ সমাজে আত্মগৌরবমূলক জাতীয় চেতনা বিকশিত হতে থাকে । নিজের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ও অতিরঞ্জিত সমাজে-ইতিহাসের রূপ নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা ধর্ম, দেশাচার, প্রথা, হিন্দুয়ানি সংস্কার, আঁকড়ে ধরার প্রবণতায় মগ্ন হয়। শাস্ত্রীয় পন্ডিত ও উঠতি ধনপতিদের কলকাতা নগর কেন্দ্রিক সমাজ জীবনে যে রক্ষণশীল মানব বিরোধী ভন্ডামী বিস্তার লাভ করেছিল তার স্বরূপ প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখনীতে বিধৃত হয়েছে। পানাসক্তির সঙ্গে জাত নিয়ে বাড়াবাড়ি অহংকার ও দলাদলি ভবশংকর বাবু ও তার সমর্থক এবং আম্বিকাচরণ হেমচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রে প্রগতিপন্থী মনোবৃত্তি সর্বোপরি রামানন্দ ও ভজহরি চরিত্রে দুর্নীতি ও লাম্পট্য বিভিন্ন নক্শা সূত্রে রূপায়িত হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে লেখক কখনও কথোপকথন ও সংলাপের সাহায্যে আবার কখনও কখনও বিবরণ ধর্মীতায় উন্মোচন করেছেন প্রতিটি চরিত্রের আন্তঃস্বরূপ । চরিত্র ও শ্রেণী অনুসারে লেখক সংলাপ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। "জাত মারিবার মন্ত্রণা"- অংশে মদ্যপান ও পারস্পরিক কথোপকথনের ভাষাভঙ্গি শব্দচয়ণ লক্ষনীয় ঃ-

"পরে প্রত্যেকে তিন চারি গ্লাস ব্রান্ডি পান করিয়া মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিলেন। বাচস্পতি। ওহে ভাই সকল, যে শীতল দ্রব্য পান করিলাম, উহা ভুলিবার নয়। চিনির পানা মিছরির পানার মুখে ঝাঁটা মারি। এ সমাগ্রী পেটে গেলে পুত্রশোক নিবারণ হয়।

বলরাম। মোশাই, পূজারি বামুন এসেনি-মাঠাকুরণ বললে যে, বাচস্পতি গিয়া ঠাকুরের আরুতি করুন।

বাচস্পতি। সর্ব্বনাশ। ব্রান্ডি আমার মাথায় উঠিয়াছে আমি দাঁড়াইতে পারিনা, তুই বলগে যা- আমি সায় সন্ধ্যা করিতেছি, সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, মিঠাইওয়ালার দোকানে একজন ব্রাহ্মণ আছে, তাকে লয়ে কর্ম্ম শেষ করিয়া দিগে।" (মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, পৃ ঃ ২২৭-২২৮)

Dhaka University Institutional Repository

''আলালের ঘরের দুলাল''- রচনায় বাংলা গদ্যে চলিত ভাষা প্রয়োগের পর 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'- রচনায় সরল- সহজ বোধ্য কথ্য ভাষার বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে এই রচনা প্যারীচাঁদের চলিত গদ্যে যে ত্রুটি থাকনা কেন তাতে সাহিত্যিক রস সৃষ্টির বিশেষ বাধা হয়নি।

''গোপনে মদ্যপানকারী ও যবনস্পৃষ্ট অখাদ্য ভক্ষণকারী ধর্মনেতার যে ছবি ''মদ খাওয়া তে এঁকেছেন তা বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় ব্যঙ্গ রচনার আদি।'' (রজনীকান্ত সেন, পৃ ঃ ১৪৯)

এ ক্ষেত্রে বিষয়ানুসারে গদ্যরীতির সৃজন প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যতম কৃতিত্ব। শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে আরবি, ফারসি, উর্দূর পাশাপাশি হিন্দি সংস্কৃত, তদ্ভব, দেশীশব্দের সমন্বিত ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

বর্ণনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানত অবলম্বন করেছেন সাধুগদ্যের । অন্যদিকে সংলাপ নির্মাণে গৃহীত হয়েছে কথ্যরীতি। অবশ্য কথোপকথন ক্ষেত্রে সাধুগদ্যের ক্রিয়াপদ অনুসৃত হয়েছে। ক্রিয়াপদে সাধু ও চলিত ভাষায় পাশাপাশি ব্যবহার কোনো কোনো স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

যেমন

''দে পাক-দে পাক-ডেডাং ডেডাং ডেংডেং। চড়ুকের পিঠ চড় চড় করে, তবুও পাদুটি নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক একবার বলে, দে পাক-দে পাক ! মাতাল ও সেইরূপ গলাগলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে-শরীর টলমল করছে-কথা এড়িয়ে গেছে-ঝুঁকে ঝুঁকে এদিক্‌ও দিক্ পড়ছে, তবু বলে ঢাল ঢাল। চড়কের পর চড়ুকেরা ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, এসে বৎসর আর সন্ন্যাস কর্‌ব না, কিন্তু ঢাকের বাজনা উঠলেই

Dhaka University Institutional Repository

পিট মড় মড় করে। সেইরূপ মাতালও মদ খেয়ে বড় ঢলায়, পরে জ্ঞান হইলে একটু একটু লজ্জা হয়, পরিবারের মিষ্ঠ র্ভৎসনায় মনে মনে শপথ করে, দূর কর, একর্ম্ম আর করব না, কিন্তু লাল জল দেখলেই প্রাণটা অমনি লাফিয়ে উঠে, বোধ করে স্বর্গ হাতে পাইলাম প্রথম প্রথম আমড়গেছে রকম এক একবার বলে, না আমি আর খাব না, পরে একবার আরম্ভ হলেই শপথ পাদাড়ে ছুটে পালায় ক্রমে বুঁধ হইয়া বসিয়া থাকে।" (মদে মত্ত হইলে জোর বিপদ ঘটে, পৃ ঃ ২০২-২০৩)

"মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" গ্রন্থে গীতময়, চিত্রময় ও কাব্যময় গদ্যের প্রকাশ লক্ষণীয় বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করার জন্য বাংলা বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার প্যারীচাঁদের ভাষারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত ও বৈধ প্রমাণ করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে জানুয়ারী মাসে রচনা করেন "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" এবং এ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক একই সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর এই উভয় গ্রন্থে শাস্ত্র, সংহিতা, স্মৃতি প্রভৃতি থেকে প্রভূত উপকরণ ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে অসাধারণ যুক্তিতায় উপস্থাপন করেন "বিধবা বিবাহ"র সপক্ষে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। বহুকাল প্রচলিত দেশাচার ও সমাজাচারের বিরুদ্ধাচারণ করায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মুখীন হয়েছিলো রক্ষণশীল মতাবলম্বী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা । এ ছাড়া বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করায় তাঁকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় চিত্ততার প্রমাণ দেন। ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ ও কয়েকজন সংস্কৃত পন্ডিত এবং অনুরাগী সমর্থক ব্যতীত কেউ তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেননি। রক্ষণশীল সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক ভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে।

'বাল্য বিবাহ' ও বহু বিবাহ-ছিল কৌলিণ্য সর্বস্ব ব্রাহ্মণদের পারিবারিক অর্থায়নের একটি সুগম পথ। সমাজ দেহে এর ফলে জন্মেছিল নানাবিধ ব্যাধি। রামমোহন রায় এবং অন্যান্য সংস্কারবাদীদের ন্যায় বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত উদ্যোগে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী, আচারের সংকীর্ণতা এবং সমাজের অবাঞ্ছিত অনাচার, অত্যাচার নিরসনে সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতায় বিদ্যাসাগর বিপন্ন হয়ে হাল ছেড়ে না দিয়ে বরং বেনামীতে ব্যঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গিতে সৃষ্টি করেছেন গতিশীল তীক্ষ্ণ, তীর্যক গদ্যশৈলী।

বিদ্যাসাগর অতীতের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন 'বিধবা বিবাহের' যৌক্তিকতা এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু সমাজের অসঙ্গতি অনেক সময় কৌতুক হাস্যে উপস্থাপিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। আবার বিরোধিতা মোকাবেলায় বিদ্যাসাগরের ছদ্মনামে লিখিত-''অতিঅল্প হইল', ''আবার অতি অল্প হইল''- এ দুটি রচনায় তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুকহাস্য ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে 'কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোষ্য' নামে বিতর্কমূলক রচনাগুলো সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে নিবেদিত। বিরুদ্ধবাদী বাচস্পতি ও বিদ্যারত্নদের ভাষা ব্যবহার ত্রুটি, শাস্ত্রবাক্যের অশুদ্ধ ব্যাখ্যা আবার কখনও তাদের অসৎচরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত এবং আচরণের অসঙ্গতি উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গিতে 'বিধবা বিবাহ বিরোধী' এবং 'বাল্য ও বহু বিবাহ' সমর্থক পন্ডিতদের ব্যঙ্গবাণে বিধ্বস্ত করেছেন। এই ক্ষেত্রে আপন পরিচয় গোপন রেখে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে তিনি কৌতুকহাস্যে মত্ত হয়েছেন।

''এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বজয়ী পন্ডিত। আজকাল শুনিতেছি, তাঁর যত বড় নাম ও যত ধূম ধাম, ততবিদ্যা ও ততজ্ঞান নাই। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, বহুবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া, একখান বহি লিখিয়া ছিলেন। তর্কবাচস্পতি খুড়, তাঁহার মত খন্ডন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একখান বহি বাহির করিয়াছেন। সেই বহি পড়িয়া সবাই বলিতেছে, এবার তারানাথের দফা রফা হয়েছে। সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাইত হে !

তারানাথটা কি ! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়। কথায় কথায় বলে, দুনিয়ার মধ্যে পন্ডিত আমি; আমার সমান কে আছে ; আমি বই, সংস্কৃত আর কে জানে ? যাঁহারা বিশেষ জানেন, তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পন্ডিত; তাঁর মুখের জোর যত, বিদ্যার জোর তত নয়। শুনিয়াছি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দিগ্‌গজ পন্ডিত ছিলেন ; তিনি তর্কবাচস্পতি খুড়র মত, আস্ফালন করিতেন না। যে রোগে আস্ফালন করায় তাঁর শরীরে সে রোগ ছিল না ;

Dhaka University Institutional Repository

"অগাধজল সঞ্চারী বিকারী নচ রোহিত ঃ ।

গড়ুষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে" ।

রুই মাছে অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই। পুঁঠিমাছ গণ্ডুষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়। "(অতি অল্প হইল"/বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ/ ১৯৫৮, পৃ ঃ ৩৫৫)

'আবার অতিঅল্প হইল'-অংশে তারানাথের বুদ্ধির স্বরূপ ও ভণ্ডামী সম্বন্ধে সকৌতুক সরস মন্তব্য বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গ রচনার অনন্য বিষয়। ব্যাকরণে মহাবোদ্ধা বলে দম্ভ প্রকাশ করলেও তারানাথের পুস্তিকা থেকে মারাত্মক ব্যাকরণ ভুল আবিষ্কার করেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'বহু বিবাহ বাদ'গ্রন্থে অযৌক্তিক ব্যাকরণ প্রয়োগ উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর ভুলত্রুটি ও শাস্ত্র সিদ্ধান্তে মারাত্মক ভ্রান্তি দেখিয়েছেন। প্রতিপক্ষের ভুল বা জ্ঞানের দৈন্য তর্কের আলাপে তিনি বিবৃত করেছেন।

"আজন্ম ব্যাকরণ ব্যবসায়ী তর্কবাচস্পতি খুড়, কোন ব্যাকরণ অনুসারে "ঘূর্ণায়মান" শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমাদিগের যে অল্প স্বল্প ব্যাকরণজ্ঞান আছে, তদনুসারে, খুড়র মত সংস্কৃত লিখিবার বাস্বংশ ঘটিলে, আমরা ঐ স্থলে হয় 'ঘূর্ণমান' নয় 'ঘূর্ণ্যমান' এই দুয়ের যা হয় একটা লিখিয়া দিতাম, প্রানান্তেও খুড়ুমত, ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দ বিন্যাস করিতাম না। সাধুভাষাভাষী বিষয়ী লোকের মুখে কখনও কখনও 'ঘূর্ণায়মান' শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ বড় খল শাস্ত্র, চিরকলা উপাসনা করিলেও প্রসন্ন হন না।" (অতিঅল্প হইল পৃ ঃ ৩৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

'আবার অতি অল্প হইল' পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর তারানাথের ব্যাকরণ ভ্রান্তির সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের ভুল দৃষ্টান্ত সম্পর্কে সব্যঙ্গ মন্তব্য করেছেন। ব্যাকরণিক ভ্রান্তি নিরসনের পরিবর্তে তারানাথের ভ্রান্তি মগ্নতা বিদ্যাসাগরের কাছে কৌতুককর মনে হয়েছে।

"কিন্তু খুড়র দোষ দেখাইয়া তিনি চটিয়া লাল হইয়া উঠেন। এই সময়ে খুড়র কাল মুখে লালের আভা মারিলে, যে শোভা হয়, অর্থাৎ বাহার হয়, তাহা বর্ণনাতীত"।

(আবার অতিঅল্প হইল/ বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, ১৯৫৮, পৃ ঃ ৩৭৭)

বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের পরিহাস রসিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু বহু বিবাহের সময় বিদ্যাসাগরের প্রবীণ বয়সে বিস্তার রসিকতা প্রদর্শন করেছেন। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য' রচিত- ১। অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ২। আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ৩। ব্রজবিলাস (১৮৮৪), ৪। কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ রচিত বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা বা বিনয় পত্রিকা (১৮৮৪), ৫। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাই পোষ্য প্রণীত রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬), এর মধ্যে প্রথম দু'খানি পুস্তিকা বহুবিবাহ আন্দোলন বিরোধী তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতের আলোচনা আছে। তৃতীয়টির আক্রমণের পাত্র বিধবা বিবাহ বিরোধী নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, চতুর্থ এবং পঞ্চম পুস্তিকা বিধবা বিবাহের বিরোধীদের উদ্দেশ্যেই লিখিত।

সামাজিক কুসংস্কার ও লোকাচারকে বিদ্যাসাগর মুক্ত বুদ্ধির আলোকে গ্রহণ করতে পারেননি, এই কারণে তিনি শাস্ত্র, যুক্তি, বাস্তবজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োগ করে বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করেন এবং এর বিরুদ্ধাচারীদের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার দ্বারা বিপর্যস্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪ নভেম্বর) যশোর হিন্দুধর্ম 'রক্ষিণী সভা' ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত সভার চতুর্থ বার্ষিকী সভায় নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বিধবা বিবাহকে শাস্ত্র বিরোধী হিসেবে অভিহিত করে সংস্কৃত প্রবন্ধ রচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী বিধানের জন্য বিদ্যাসাগরের সমর্থনের আশায় অর্থ প্রাপ্তির বদৌলতে শাস্ত্রীয় বচন পরিবর্তন করেন। বিদ্যাসাগরের জিজ্ঞাসা-

"আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন পূর্ব্বব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তখন কি এ রচনাটি আপনার মনে উপস্থিত হয় নাই? "বিদ্যারত্ন, সহাস্যবদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন ফচন দেখা যায়।"

(বিদ্যাসাগর রচনাবলী ৪ র্থ খন্ড/ব্রজবিলাস, পৃ ঃ ৪৯২)

'বেহুদা পন্ডিত' ব্রজনাথের এ প্রবণতার সঙ্গে জীবন ধারণের অর্থোপার্জন জড়িত ছিল। সংস্কৃত পন্ডিতদের উপার্জনের ক্ষেত্র সংকুচিত হলে তারা আত্মনিয়োগ করেছিল যে কোন উপায়ে রৌপ্যচক্র হস্তগত করার প্রচেষ্টায় । ধনবানের মনঃ রক্ষার্থে দল বিশেষের মনোরঞ্জনে কিংবা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ রক্ষায় শাস্ত্রীয় বিধানের যেন-তেন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। বিদ্যাসাগর বিদ্যারত্নের এ ধরনের আচরণকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করার জন্য শিরোমনির গল্প ফেঁদেছেন। এ গল্পে দেখা যায় শিরোমনি স্ত্রী জাতির ব্যভিচার সন্ধন্ধে যে বিধান দিনের বেলায় প্রদান করেন, রাতে তার জনৈক সেবাদাসী অনুসরণ করতে গেলে ভিন্নতর বিধানের উল্লেখ করে তাকে তার চরণ সেবায় প্রবৃত্ত করান-

"সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পন্ডিত চূড়ামনি শিরোমনি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্ত ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, "আরে পাগলি ! তুমি সেই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না ? আমরা পূর্বাপর, যে রূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমূল গাছ

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে যে রূপ ভয়ংকর ছিল, যথার্থ বটে; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে, লৌহময় কন্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে শিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; এখন আলিঙ্গন করিলে সর্বশরীর ও পুলকিত হয়"।

(বিদ্যাসাগর রচনাবলী/দ্বিতীয় খন্ড/দেব কুমার বসু সম্পাদিত ব্রজবিলাস/পৃ ঃ ৪০৫)

বিদ্যাসাগর ব্রজনাথকে নদিয়ার চাঁদ রূপে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন শ্রীমতি যশোহর হিন্দুধর্মের রক্ষিণীসভা ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদীয়াচাঁদ উপাধি দিয়েছে। কিন্তু এক সময় দুই চাঁদ দেখা যায় না এই জন্য একজনেরই নদিয়ার চাঁদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একজন বঞ্চিত হবে। তাছাড়া এ উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে কলহ সমূহ এই জন্য বিদ্যাসাগর দু'জনকেই অর্ধচন্দ্র দিয়ে সন্তুষ্ট করে বিদায় দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ' প্রবর্তক দুটি পুস্তকে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কের পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের সেই সকল যুক্তি খন্ডন না করে পরাসর বচনকে বাগদত্তা সম্পর্কিত রূপে অভিহিত করতে গিয়ে মূঢ় পাণ্ডিত্যের বৃথা আস্ফালন করেন।

বিদ্যাসাগর বিদ্যাবাগিশ খুরে। মহাশয়ীদের বাগারম্ব সহ্য করতে না পেরে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্যে বিদ্যারত্নের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। বিদ্যাসাগরের "তিনি (খুড়) যে "ভাইপোষ্য" এই প্রয়োগ দর্শাইয়া প্রয়োগকর্তাকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন, তদৃষ্টে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তদীয় অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির সবিশেষ প্রশংসা করিতেছেন। এত বুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। হতভাগার বেটা, কি শুভক্ষণেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল!!! এই পৃথিবীতে অনেকের বুদ্ধি আছে ; কিন্তু, খুড়র মতো খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে, খুড়র আপদ-বালাই লইয়া, এই দন্ড মরিয়া যাই, খুড় আমার অজর, অমর হইয়া, চিরকাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে,

Dhaka University Institutional Repository

খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক ; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, যেটা বিষম, টোকা ও পোকাখেকো।"

(আবার অতি অল্প হইল"/বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ১৯৫৮ পৃঃ ৩৮৭)

'বিধবা বিবাহ আন্দোলন' বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের মহত্তম কার্য বলে মনে করেন। এ আন্দোলন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল প্রাচীন ও নবীনদের মধ্যে ব্যবধান দূর বিস্তারি। বিধবা-বিবাহর বিরোধ নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে তাদের অযৌক্তিক মতামতকে খণ্ডন করেছেন বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে এ রকম ঐচ্ছিক কীর্তিকে প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলা ছিল কষ্টকর। ১। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম খন্ড) (১৮৫৫ জানুয়ারী) ২। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দ্বিতীয় খন্ড) (১৮৫৫ অক্টোবর) গ্রন্থ দুটি রচিত হলেও বহুকাল প্রচলিত দেশাচার ও সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধবাদীদের জন্য "বিধবা বিবাহ" সফল হয়নি। এ জন্য দেশাচারের কাছে বিধবা বিবাহ আন্দোলন পরাস্ত হয়। অর্থাৎ লোকাচারের মুখে এবং কৃতবিদ্য রক্ষণশীল গণ্যমান্যের অযৌক্তিক প্ররোচনায় উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, উদারতা ও মানবিক মূল্যবোধ সমূহ আত্মপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। বিশেষত ব্রাহ্মগণ বিধবা বিবাহের পোষকতা করার ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজের মনোভাব "বিধবা বিবাহ" সম্পর্কে আরও প্রতিকূল হয়ে পড়ে। এ কারণে বাচস্পতি, বিদ্যারত্নদের বিরোধিতা বিদ্যাসাগরকে অকুতোভয়ে মোকাবেলা করতে হয়েছে।

"অমিতক্রম ও অকুতোভয় বিদ্যাসাগরকে বন্ধু, শত্রু, আত্মীয়, সংবাদপত্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের সঙ্গেই লিপিযুদ্ধ করতে হয়েছে। 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়েছেন, অনেক ধূর্তব্যক্তি তাঁকে বঞ্চনা করে নিঃশেষ করেছে। শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছোট লাট সিসিল বিডন সায়েবের কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদের প্রার্থী হতে হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি মনে করতেন, "বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন

Dhaka University Institutional Repository

সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই । এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙমুখ নই।" (ভূমিকা/বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ/দ্বিতীয় খন্ড)

'বিবাহ বিবাহ' শাস্ত্রবিরোধী বহুকাল যাবৎ অপ্রচলিত এবং ফলত দেশাচার বিরোধী এসব যুক্তি সমাজের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতরা বার বার উচ্চারণ করেছেন। বিদ্যাসাগর প্রতিউত্তরে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেন। কিন্তু অবিবেচক পন্ডিতরা তাঁর সিদ্ধান্তকে বাতিল করার চেষ্টা করলে বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজের এ সব উচ্ছিষ্ঠ ভোজী পণ্ডিতদের জ্ঞানহীনতা ও দুর্নীতি-লাম্পট্যের স্বরূপ তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে কখন ও তিনি রুষ্ট, রাগান্বিত, আবার কখনও বা অসংযমী মনোভাবের প্রকাশ দেখিয়েছেন। তিনি সংস্কৃত পন্ডিতদের দুরাচার সম্পর্কে বিচিত্র ঘটনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে চিত্রিত করেছেন। কখনও সংস্কৃত শ্লোক কখনও বা সরস বাক্য প্রয়োগে আবার কখনও বা বিশিষ্ট শব্দ ও প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে তাঁর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছেন।

প্রতিপক্ষের মূর্খামি ও নষ্টামিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মর্মান্তিক খোঁচা দিয়ে বিদ্যাসাগর উদ্যম হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা ব্যবহার কৌশল প্রত্যক্ষ ও সরল হয়ে উঠেছে। হাস্যরস সম্পৃক্ত আরবি, ফারসি, সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত অংশের একটি দৃষ্টান্তঃ

"বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে বিধবা বিবাহ আন্দোলন এক সূত্রে গাঁথা, বিধবা বিবাহকে তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম কার্য বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র নারায়নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিধবা বিবাহ করেন, তখনো তাঁর রক্ষণশীল আত্মীয় স্বজন বিদ্যাসাগরকে ত্যাগ করার হুমকি দেন । এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর মনোমালিণ্য ঘটে। অন্যেরা এ বিয়েকে ব্যঙ্গ করে পুস্তক প্রকাশ করেন।

(গোলাম মুরশিদ, ১৯৮৪, পৃ ঃ ৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ানুসারী গদ্য রীতির ব্যবহার বিদ্যাসাগরের অন্যতম কৃতিত্ব। বিশেষত বিশুদ্ধ বিবৃতির জায়গায় একরকম, আবেগে এক রকম বিতর্কে এক রকম লঘু সংলাপে অন্যরকম সেই মৌখিক সংলাপের স্পন্দনকে আয়ত্ত করে, শিল্পিত স্বভাবকে পরিণতি দান অন্যতম সাফল্য।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষার সঙ্গে তদ্ভব, দেশি শব্দের সুষম মিশ্রণ ঘটিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে সঞ্চার করেছেন কথ্যরীতির স্বপ্রাণস্পন্দন। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্য আবেষ্টন থেকে বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন যুক্তি নিষ্ঠা ও পরিমাণ বোধ, প্রসাদগুণ ও বাস্তবতা প্রভৃতি।

সীতারবনবাস, শকুন্তলা, বেতাপঞ্চবিংশতির গদ্য, বিদ্যাসাগরী গদ্য রূপে চিহ্নিত। দীর্ঘ সমাস বহুল বাক্যকে ভেঙ্গে ছোট ছোট বাক্যে পরিণত করে যথাযথ ছেদ চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থময় বাক্যাংশ সৃষ্টি করে ক্রিয়ারূপ ও শব্দকে সরল করে এবং শ্বাস-অনুযারী, অর্থ-অনুযায়ী বাক্যাংশকে সাজিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসামান্য লাবণ্যময় গদ্য। অন্যদিকে ছদ্মনামে বা বেনামীতে রচিত পুস্তিকা গুলো বিদ্যাসাগরের মজলিসী ঢং অর্থাৎ মুখের কথাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মিশেল দিয়ে যুক্তির সাহায্যে শরজাল বর্ষণে কথা বার্তায় ভাষার স্বভাবে ব্যক্ত হয়েছে-

"বোঝা যায় ঐ সব আনাড়ি ফাজিল-চালাক বাবুজিদের বিদঘুটে বেয়াড়া কান্ড কারখানা দেখে, তিনি যে মজাদার রচনাগুলো লিখেছিলেন তাতে কলমের আগায় শব্দগুলো এসেছিল তাঁরই মুখের চলতি বুলি থেকে। তাতে স্ল্যাং ব্যবহারে দ্বিধা নেই, কিন্তু সেই কৌতুকে ঝলমল রচনার আলালী স্ল্যাঙের অবক্ষয় নেই, রুচির পরিমিতি বোধের অভাব নেই।"(অশ্রু কুমার,সিকদার, ১৯৭১, পৃঃ ৪)

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ ব্যবহার বাক্য নির্মাণে বিদ্যাসাগর প্রথম দিকের রচনায় সংস্কৃতি রীতির পোষকতা করলেও শিল্পীর সুকুমার অনুভূতি বোধ তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্থায়ী জায়গা পেয়েছে। অন্যদিকে মজলিসী ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত দেশজ শব্দ ব্যবহার কথ্যরীতির বাক্-স্পন্দনে অনতিলক্ষ্য ধ্বনি সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে। আক্রমণ ও সরস বিদ্রূপে প্রতিপক্ষকে নাকাল করার জন্য সমসাময়িক উত্তেজনায় লেখা-''অতি অল্প হইল'', ''আবার অতি অল্প হইল'', ''ব্রজবিলাস'' প্রভৃতি, পুস্তিকায় শব্দ নির্বাচন, ভাষা ব্যবহার, গদ্যরীতির বিভিন্ন দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

১। ''যাহা হউক খুড় কেমন সংস্কৃত লিখেছেন, ইহা দেখিবার জন্য, তাঁর পুস্তকের কিয়দংশ পড়িলাম পড়িয়া খানিক ক্ষণ, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম; দেখিলাম; স্মৃতিবিদ্যা, রচনাবিদ্যা, ব্যাকরণবিদ্যা, খুড় আমার তিন বিদ্যাতেই মূর্তিমন্ত্র। যদি আর আর বিদ্যাতে ও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত। আমি তাঁর উপযুক্ত ভাইপো বটে, কিন্তু তাঁর মত বেহুদা পন্ডিত নই।'' (অতি অল্প হইল''/বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পৃ ঃ ৩৫৬)

২।''হঠাৎ এমন সব কথা, আমার মুখ থেকে, বেরিয়ে পড়ে যে, আমি উপযুক্ত ভাইপো বলিয়া, অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়। ভাগ্যক্রমে, আমি, তাহাও সম্ভব বোধ হইতেছে না। লোকে জানে, আমার চালাকি ফচ্‌কিয়ামি আইসে না; কিন্তু, আমার পুস্তকে ঐ দুয়ের ভাগই অধিক; সুতরাং আমি ঐ অপূর্ব গ্রন্থের রচয়িতা, লোকের সহসা এরূপ সংস্কার হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুত ঃ আমি চালাক ও ফচ্‌কিয়া নই। কিন্তু মা সরস্বতীর আমার উপর এমনি দয়া যে, লিখিতে বসিলে অস্পদীয় অতিদুর্দান্ত; মহাবল, পরাক্রান্ত কলম বাহাদুরের প্রফুল্ল মধু পদ্ম হইতে ফচ্‌কিয়ামি মধু ভিন্ন, অন্য কোনওরস, বড় একটা নির্গত হয় না।'' (''আবার অতি অল্প হইল''/ বিদ্যাসাগর রচনাবলী পৃ ঃ নং ৩৯১)

Dhaka University Institutional Repository

৩।"আপনি বেয়াড়া পন্ডিত ; কিন্তু আপনার মত, বেয়াড়া আনাড়িও প্রায়, চক্ষে পড়ে না । যে দিন, সর্ব্বপ্রথম, আপনার চাঁদ মুখ নয়নগোচর করিয়া, মানবজন্ম সফল করি; যে দিন, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন-ফচন দেখা যায় না; এই কবুল দিয়া, হদ্দমুদ্দ আনাড়ির কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সাবধান করিয়া দিতেছি, যে উত্তর কালে, আর কখনও, ও রূপ মুখ আলগা না হন। যশোহর হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভায় সভ্য মহোদয়দিগের আহবান, অনুসারে, সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বেশ করিয়াছিলেন ; তাঁহারা সভায় বক্তৃতা করিতে বলিয়াছিলেন ভালই; আপনকারদের দস্তর মত, পাগলের ন্যায়, কতকগুলো অগড়ম বগড়ম বকিয়া, খানিকক্ষণ গোলমাল করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেই, বেশ হইত। তাহা না করিয়া, বক্তৃতা লিখিয়া, ফাঁদে পা দিলেন কেন। যে রূপ জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ছড়াইয়া উঠা কঠিন। বলিতে কি, আপনি অতি বড় বক্কেশর"। (অশ্রুকুমার সিকদার, ১৯৭১ , পৃ ঃ ১১২)

মূলত এসব বেনামী রচনায় মানুষের মুখের ভাষার স্পন্দনে বাক্য নির্মিতি কৌতুক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । বিদ্যাসাগর স্বতন্ত্র শিল্পবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে বিরাম চিহ্নের সার্থক প্রয়োগ প্রদর্শন করেছেন। এ ক্ষেত্রে মজলিসী মেজাজ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, শ্লেষ চাতুর্য ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের সমবায়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ জাতীয় পুস্তিকাগুলো রচিত। এ সব রচনার ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

"ব্রজবিলাস ও তজ্জাতীয় বিতণ্ডা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ভাষা কেমন টাট্টুঘোড়ার ছুটিয়াছে, চার পায়ের আঘাতে গ্রাম্য শব্দের লোষ্ট্রখন্ড ছুটিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে আহত করিয়াছে।"

(বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার/শ্রী প্রথম নাথ বিশী সম্পাদিত)

বস্তুত যতি স্থাপনের বৈচিত্র্য গতিশীল শব্দ ব্যবহারের কৌশলে এবং সর্বোপরি গদ্যরীতিতে বুদ্ধি ও ব্যঙ্গের দীপ্তময়তায় বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনা সমূহ অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ব্যঙ্গ কৌতুক পূর্ণ রচনা 'লোকরহস্য' 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অন্যদিকে 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে । উল্লিখিত রচনাত্রয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন বাঙালী সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ।

এই রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ধারায় বিশিষ্ট। উপনিবেশিক শাসনামলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সংকট, আত্মজিজ্ঞাসা জাতিসত্তা সন্ধান ও আত্মসত্তার অন্বেষণ আলোচ্য গ্রন্থ গুলোর বিষয় ।

এই রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। সামাজিক অসঙ্গতির ব্যঙ্গ ও কৌতুককর ঘটনার বিবরণ ।

২। মানব চরিত্র সম্পর্কে লঘু গূঢ় কৌতুক।

৩। সরস বর্ণনায় আত্মযাতনার বিন্যাস।

৪। ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার "রঙ্গব্যঙ্গ" রূপায়ণ ।

৫। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ইংরেজ প্রীতি ও সাংস্কৃতিক অনাচারের উপহাস পূর্ণ চিত্র।

৬। ব্যক্তিগত, সমাজগত ও রাজনৈতিক অপমান লাঞ্ছনা ও বেদনার অভিব্যক্তি।

৭। বর্ণনা ভঙ্গিতে শ্লেষ-মিশ্রিত সহজ সরল প্রকাশ।

৮। গতানুগতিক প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা।

৯। বিদ্রূপের আবরণে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানির উদ্ভাস।

Dhaka University Institutional Repository

১০। বর্ণনায় নাটকীয়তার প্রাধান্য।

১১। চটুল মৌখিক ভাষাভঙ্গির ব্যবহার।

মানব চরিত্র সম্পর্কে কৌতুককর বিবরণের মাধ্যমে ব্যঙ্গবিদ্রূপ নিক্ষিপ্ত হয়েছে 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) গ্রন্থে. সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক হাল্কা মজলিসী পরিহাসের ঢং-এ অনেক তত্ত্বকথা এ গ্রন্থে অভিব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব সংকট আত্মসত্তা সন্ধান, জাতিসত্তার সন্ধান, সুতীব্র বেদনা, সরস পরিহাসে গীতিমূর্ছনায় প্রকাশিত 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)। 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'- রচনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যঙ্গ স্থান পেয়েছে। মূলত বঙ্গ-দর্শন' প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের মানস জগতে রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও ব্রিটিশ সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র নিরক্ষর ও সাধারণ জনতার প্রতি অসামাজিক আচরণ, দম্ভ, স্বাতন্ত্র্যের স্বভাব তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পর্বে অপহৃত। তিনি অনেক অংশে সামাজিক সাধারণ মানুষের প্রতি সহৃদয়। এই সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে পত্র সূচনায় তিনি লিখেছেনঃ

"এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যাদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা সম্পন্ন।"

(অরবিন্দ পোদ্দার, ১৯৫১, পৃ ৬২)

'বঙ্গদর্শন' থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প সৃষ্টি নতুন তাৎপর্যে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষত নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব সম্পর্কের সম্মুখীন হয় এবং আত্মচেতনার সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবকে নবরূপে রূপায়ণের জন্য গণমানস কর্ম বিপ্লবে দীক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন সমসাময়িক বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্মোপলব্ধির দৈন্য দূর করে সকল জড়তা ও আচ্ছন্নতা, সহজ প্রাপ্তির স্বপ্নময়তা থেকে গণসচেনতার প্রয়াসে বঙ্কিমচন্দ্র নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত করতে চেয়েছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাস বাক-চাতুরি ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ সৃজনের মধ্যদিয়ে তিনি তৎকালীন মধ্যবিত্তের অসঙ্গতির রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন।

স্বদেশী সমাজ রাজনৈতিক ব্রিটিশ শাসনের গুরু, সামাজিক বৈষম্যের উৎস নির্মোহ দৃষ্টি ভঙ্গিতে ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'লোকরহস্য' গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থে-

"ব্যঙ্গ বিদ্রূপের, হাসি-অশ্রুর অন্তরালে থাকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত গণ-মানসকে গ্লানির আচছন্নতা হইতে টানিয়া বাহির করিবার ব্যাকুল প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।" (অরবিন্দ পোদ্দার ১৯৫১, পৃ ঃ ৬৯)

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কবি সাহিত্যিক সমকালের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিচিত্র-অসঙ্গতি অবলম্বন করে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু তাঁদের রচনা কোন ঘটনা বা চরিত্রের অসঙ্গত আচরণের উপরিতলে কৌতুকপূর্ণ নক্শায় উদঘাটিত হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রূপের পশ্চাতে সমকালীন সমাজ প্রবর্তনা সক্রিয় থাকে। কিন্তু এই সব লেখক এর অন্তর ব্যবচ্ছেদ করতে সক্ষম হননি। এক্ষেত্রে সামাজিক জীবনের মর্মমূল থেকে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারাকে সূক্ষ্ম মননশীলতায় বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক অভিরুচিতে অভিষিক্ত করেন বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সন্ধন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

"তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুষ্কহাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়াছেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তায় বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে যে বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ-সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

(ড ঃ অজিতকুমার ঘোষ, ১৯৬০, পৃ ঃ ৩১৩-২৩)

রবীন্দ্রনাথ আর বলেছেন ঃ- "নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আণয়ন করে "

(অজিত কুমার ঘোষ, ১৯৬০, পৃ ৩১৪-১৫।

বঙ্কিমের ব্যঙ্গ রচনায় তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রত্যক্ষ ও আত্মসচেতন প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় রচনায় শ্লেষ, মন্তব্য, বক্রোক্তি, তাঁর মন ও মতের পরিপোষক তাঁর 'লোক রহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৮৪) "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত (১৮৭৫)"- এই তিনটি গ্রন্থে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উন্নত রস ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। 'লোকরহস্য' বঙ্কিমচন্দ্রের তপ্ত মধুর ব্যঙ্গে অসামান্য সৃষ্টি গ্রন্থটি নিম্ন বর্ণিত শিরোনামে লিখিত

১। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' ২। 'ইংরেজী স্তোত্র'। ৩। 'বাবু' ৪। 'গর্দ্দভ' ৫। 'দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইন' ৬. 'বসন্ত ও বিরহ' ৭। 'সুবর্ণ গোলক' ৮। 'রামায়ণের সমালোচনা' ৯ 'কোন "স্পেশিয়ালের"পত্র' ১০। BRANSONISM ১১। 'হনূমদ্বাবু সংবাদ' ১২। 'গ্রাম্য কথা' ১৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' ১৪। ' NEW YEAR'S DEY'

Dhaka University Institutional Repository

"ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের রস-উচছলতা স্বার্থান্ধ মানব পশুর চরিত্রের উপর নির্ম্মম কশাঘাত ; গর্দ্দভের ব্যাঙ্গোক্তিতে তাহাই আরও নির্ম্মম। দাম্পত্য দণ্ড বিধি আইনে তিনি যে লঘু কল্পনায় ইন্দ্রজাল বুনিয়াছেন, তাহাই 'বসন্ত ও বিরহে' ও বিবিধ প্রবন্ধে প্রাচীনা ও নবীনায় কৌতুক স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছেন শেষোক্ত প্রবন্ধে স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটি বিতর্কের মধ্য দিয়া অমীমাংসিত পরিণতির রসচেতনার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। রামায়ণের সমালোচনের বিদ্রূপ অতিশয়োক্তি সঞ্জাত- এই খানে অযোগ্যের আস্ফালন অযথা সম্মান ভারে লাঞ্ছিত হইয়াছে। "বাবু" প্রবন্ধটি 'লোকরহস্যে" একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। জন মেজয় বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের মুখে প্রবন্ধটির বিস্তৃতি সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে একটি সুগম্ভীর প্রাচীনত্বের কাঠামো বাঁধিয়া রাখিয়াছেন মানব চরিত্র ব্যাখ্যাতা বৈশম্পায়ণ তথা বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধির অতর্কিত স্ফুরণ, বিদ্রূপের আকস্মিক বিস্ময় সৃষ্টি ও সর্বোপরি অর্ন্তদৃষ্টির সুনিশ্চিত লক্ষ ভেদই বাবুকে চিরদিনের জন্য ধূল্যবলুষ্ঠিত করিয়াছেন।"

(বঙ্কিম রচনাবলী/ভূমিকা ১৯৬১, পৃঃ ১৬-১৭।)

'লোকরহস্যের' ব্যঙ্গের লক্ষ্য বিচিত্র তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অসহিষ্ণু কিরণে ব্যঙ্গ আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এ গ্রন্থ বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ঈঙ্গিত করে না বরং শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মানুষের প্রতি তা প্রযুক্ত। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে আবির্ভূত 'ইয়ংবেঙ্গল' ও বাবু সম্প্রদায়ের অসংযত উচ্ছৃংখলতা ও দৌরাত্ম সামাজিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলে। একদিকে নবীনদের এ ধরণের তৎপরতা অন্যদিকে রক্ষণশীল ধর্মানুগত্য ও সংস্কারাচ্ছন্ন এই দুই বিপরীতমুখী অবস্থায় সমাজ জীবন যখন তরঙ্গায়িত আন্দোলিত তখন বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। 'লোকরহস্য' গ্রন্থে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীণকে মূল্যায়ন করেছেন। আবার শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ইংরেজের বিকৃত অনুকরণ বিজাতীয় ভাব ও

Dhaka University Institutional Repository

আচরণ অনুসরণ এবং অন্ধ আনুগত্য বিভাষী, বিজাতীয় বিদেশী ভাষার প্রতি মোহ প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গবাণে অনাবৃত করেছেন।

"বঙ্কিমচন্দ্র ও যেন তিন কোটি লোকের নির্বুদ্ধিতা ও অধোগতি দেখিয়া তাদের প্রতি নির্মম বিরক্তি লইয়াই এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলেন। বিকৃত বুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি পরানুকরণপ্রিয় সম্প্রদায়কে তিনি যেন মানুষ শ্রেণীতে বসাইতেও রাজি নহেন। যে জন্য তাহাদিগকে তিনি ব্যাঘ্র, গর্দ্দভ ও হনুমান রূপেই বিচিত্র করিয়াছেন।" (অজিত কুমার ঘোষ, ১৩৫৭ পৃঃ ৩২০)

মূলত 'লোকরহস্যের' বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বিশেষ মানুষের চারিত্রিক বিকৃতিকে অনেকাংশে পশুর প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন।

"ব্র্যাঘ্রচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল" অংশে বিকৃত মানুষকে কখনও চতুষ্পদ, আবার কখনও মানুষ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যহীনতার কথা প্রকাশ করেছেন। এমন কি মানব জাতির অপরিণামদর্শিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। গরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখিয়ে তাদের বানর রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে

"মানুষালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। যে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুল শূন্য সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চ পদস্থ বোধ হয়, বংশমর্যাদা বা জাতি গৌরব ইহার কারণ।"

(বঙ্কিম রচনাবলী, ১৯৬১, পৃঃ ৪)

মানব জাতির বিবাহ ও পুরোহিত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সুতীব্র ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। পুরোহিতদের লোভী প্রবৃত্তি তিনি ব্যঙ্গবাণে উন্মোচন করেছেন। এ ছাড়া মানুষের মুদ্রাপ্রীতি ও পরস্পরের অমঙ্গল প্রচেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমের কৌতুক রসে সিক্ত হয়েছে। মুদ্রা কিভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের জন্য বিষময় রূপ ধারণ করে তার পূর্বাপর বিশ্লেষণ উপস্থাপতি হয়েছে।

"মুদ্রাকে বঙ্গা মনুষ্য পূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র। মানুষেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয় ঃ এই জন্য সচরাচর মুদ্রা সংগ্রহ জন্য যত্নবান। মনুষ্যগণ কে মুদ্রাভক্ত জানিয়া ভাবিলাম খাইয়া দেখিতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মানুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। দিবস উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ তাহাতে সংশয় কি ?"

(বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ৭)

"ইংরাজস্তোত্র"- অংশে মহাভারতের অনুসরণে ইংরেজ জাতিকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে এক অর্থে এর সম্বোধন ভঙ্গিতে রয়েছে ব্যঙ্গের প্রলেপ।

"আমি বিধবার বিবাহ দিব ঃ কুলীনের জাতি মারিবা, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব-কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ ঃ তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

(বঙ্কিম রচনাবলী ১৩৬১, পৃ ঃ ১০)

উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজ উপনিবেশ উদ্ভূত দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনে সৃষ্ট হয় বহুবিধ ব্যাধি। বিশেষত আকস্মিক ঋণ প্রাপ্তিতে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বাঙালীদের নৈতিক স্খলন অনাচার, বিকৃতি ও ইংরেজদের ব্যর্থ অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও গ্রহণীয় মনে হয়নি। এ ছাড়া সুশিক্ষিত 'ইয়াংবেঙ্গল' সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি, ভাষা সাহিত্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং তাদের ছদ্ম আভিজাত্য ও নানাবিধ

Dhaka University Institutional Repository

সংকীর্ণতা বঙ্কিমের লেখনীতে অভিব্যক্ত হয়েছে। বাবু সম্প্রদায়ের যে চিত্র জন মেজয়, বৈশম্পায়ন কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছিল তা অনন্য। তিনি চশ্মা অলঙ্কিত উদার চরিত্র বহুভাষী সন্দেশ প্রিয় মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ এবং কেরানী বাজার সরকার ধনি, কাব্যরসে বঞ্চিত, সঙ্গীতে অনুৎসাহী, বাবুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। এর কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

"যাহারা চিত্রবাসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাদুকা, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষা- পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ ! এমন অনেক মহাবুদ্ধি সম্পন্ন বাবু জন্মিবন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যলাপে অসমর্থ হইবেন যাহাদিগের দর্শন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ যাঁহাদিগের কেবল রমনেন্দ্রিয় পরজাতি নিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলে লেখণী ধারণে এবং বেতন গ্রহণে সুপটুং- চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপার নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহার সহিষ্ণু ; যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্য সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাদান করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন তাঁহারাই বাবু।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ১০)

বাবু চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে গর্দ্দভ রূপী মানুষের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পৌরাণিক রীতিতে গর্দ্দভকে যে ভাবে অভিহিত করা হয়েছে তাতে ব্যঙ্গের তীব্রতা সহজে অনুভূত হয় । এই অংশে লেখক দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের নির্বোধ অহংকারকে নিয়ে উপহাস করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

"হে রজক গৃহভূষণ কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপন পূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী মণ্ডপ মধ্যে বসন্তীয় বালকগণকে গর্দ্দভলোক প্রবেশ করিলে, "প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল" বলিয়া, মহা গর্জ্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ১২)

"ইংরেজদের ভাষার" পোষাক পরিচ্ছেদ, ও আচার ব্যবহারের অনুসরণ করতে গিয়ে বাঙালিরা কিভাবে ব্যঙ্গের পাত্রে পরিণত হয়েছিল সে দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। ইংরেজদের সাহচর্য্যে স্বদেশীয় ও স্বজাতির প্রতি বিমুখতা বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করতে পারেন নি। এ জন্য নব্য শিক্ষিতদের ইংরেজী নববর্ষ পালনের ঘটনা হাস্যরসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামবাবু ও শ্যামবাবুর ইংরেজী নববর্ষে পারস্পরিক সম্ভাষণ রামবাবুর স্ত্রীর কাছে কৌতুককর মনে হয়েছে।

"রাম ! সে কি ? খেলার কথা কখন হলো ?

স্ত্রী ! ঐ যে সেও বল্লে, "হাড়ু ডু ডু" তুমি ও বল্লে, "হাড়ু ডু ডু ! "তা, "হাড়ু ডু ডু খেলবার কি আর, তোমাদের বয়স আছে? রাম ! আঃ পাড়াগেয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল ! ওগো হা ডু ডু নয়: হ' ডু ডু অর্থাৎ How do you do ? উচ্চারণ করিতে হয় , "হা ডু ডু" !

স্ত্রী ! তার অর্থ কি ?

রাম ! তার মানে "তুমি কেমন আছে ?"

স্ত্রী ! তা কেমন করে হবে ? যে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছে" তুমি তো কৈ তার কোন উত্তর দিলে না, তুমি সেই কথাই পালিটিয়া বলিলে,

রাম ! সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্যরীতি।

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী ! পাল্‌টে বলাই সভ্যরীতি ? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, "লেখাপড়া করিসনে কেন রে ছুঁচো ? " সেও কি তোমাকে পাল্‌টে বলবে "লেখাপড়া করিস্‌নে কেন রে ছুঁচো ? "এটাই সভ্যরীতি?"

(বঙ্কিম রচনাবলী ১৩৬১, পৃ ঃ ৪৮)

"কোন স্পেশিমালের পত্র"- অংশে এ ধরণের বাঙালী বাবুদের মিথ্যাচার ইংরেজ প্রীতি ও ফাঁকা পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালীদের বিচিত্র পোষাক পরিধান ও বিচিত্র জাতি গোষ্ঠীর একত্রে বসবাস সম্পর্কে ব্যঙ্গ উক্তি স্মরণীয় ।

"বাঙ্গালীদিগের একটি বিশেষগুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যে রূপ লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।" (বঙ্কিম রচনাবলী ১৩৬১, পৃ ঃ ৩২)

"যাহা থেকে, ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিবা । তোমরা শুনিয়াছ যে, হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত ; কিন্তু তাহা নহে । ইাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি। ১। ব্রাহ্মণ, ২। কায়স্থ , ৩। শূদ্র, ৪। কুলীন, ৫। বংশজ, ৬। বৈষ্ণব, ৭। শাক্ত, ৮ রায়, ৯। ঘোষাল, ১০। টেগোর, ১১। মোল্লা, ১২। ফরাজি, ১৩। রামায়ণ, ১৪। মহাভারত, ১৫। আসাম গোয়াল পাড়া, ১৬। পারিয়া, ডগ্‌স। (বঙ্কিম রচনাবলী ১৩৬১, পৃ ঃ ৩২)

'লোকরহস্য' গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয়ের "সুবর্ণ গোলক" আখ্যানে কৌতুক রসের দৃশ্য অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। মহাদেব কর্তৃক উমাকে প্রদত্ত "সুবর্ণগোলক" পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর কালীকান্ত বাবু উক্ত গোলক পথমধ্যে পেয়ে তার ভৃত্য রামাকে প্রদান করেন। উক্ত সুবর্ণ গোলকের চিত্ত বিনিময় গুণ

Dhaka University Institutional Repository

রামা কালীকান্ত বাবু ও কালীকান্ত বাবু রামাতে পরিণত হয়ে গেল । ফলে রহস্য জটিল ঘটনার সৃষ্টি হয় কালীকান্ত বাবুর শ্বশুরালয়ে নিজ গৃহিণীর সামনে সুবর্ণ গোলকের বদৌলতে কৌতুককর ঘটনার সৃষ্টি হয় শেষাবধি এর পরিসমাপ্তি ঘটে মহাদেবের হস্তক্ষেপে । মহাদেবের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

"মহাদেব কহিলেন হে শৈলসুতে ! আমার গোলকের অপরাধ কি ? একান্ত কি আছে নতুন পৃথিবীতে হইল ? তুমি কি নিত্য দেখিতেছনা যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু হইয়া বসিতেছে করে না দেখিবা যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে , স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা সে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়া ও দেখে না আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এ ক্ষণে গোলক সংস্কৃত করিলাম।"

(বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ২৭)

এ অংশে চরিত্র চিত্রণ লেখকের ব্যঙ্গ মনোভাবের সদৃশ । অন্যদিকে, "দাম্পত্য দণ্ডবিধ আইনে " তিনি যে লঘু কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনিয়াছেন, তাহাই 'বসন্ত ও বিরহে' ও বিবিধ প্রবন্ধের প্রাচীনা ও নবীনায় কৌতুক সিগ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটি বিতর্কের মধ্যদিয়া অমীমাংসিত পরিণতির রসচেতনার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছেন।"

(ভূমিকা/বঙ্কিম রচনাবলী ১৩৬১, পৃ ঃ ১৬)

'দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইন'- অংশে সামাজিক দোষ ও অন্যায় নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে স্ত্রীজাতির 'স্বত্বরক্ষিণী সভার' প্রণীত আইনে মদ্যপান অর্থব্যয় স্ত্রী বিদ্রোহীর অপরাধ প্রভৃতি অনুষঙ্গ আইনের ধারার ন্যায় বিবৃত হয়েছে। শ্লেষাত্মক রীতিতে লেখক ব্যঙ্গের সার্থক প্রয়োগ প্রদর্শন করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত "রামায়ণের সমালোচনা" অংশে কোন স্পেশিয়ালের পত্রের মতই বিদেশী পন্ডিতদের উদ্ভট গবেষণা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অযোগ্য পণ্ডিতের আস্ফালন (বঙ্কিমচন্দ্রের লেখণীতে কৌতুক হাস্যে বিবৃত হয়েছে।

বিশেষত 'রামায়ণের সমালোচনায়' বিলাতী সমালোচক যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে তা হাস্যকর রামায়ণকে স্থূল অর্থে বানরদের মাহাত্ম্য বর্ণনা কাহিনী হিসেবে অভিহিত করে অনার্য্য বানর কর্তৃক লঙ্কা জয় রাক্ষসদের সর্ব্বাংশে নিধন বর্ণনীয় বিষয় রূপে উল্লেখ করিয়াছে। সমালোচক সীতাকে অসতী আখ্যা দিয়ে ভারত বর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্ত্রীদের অন্তঃপুর- বাসিনীর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়া লক্ষ্মণকে হিন্দু স্বভাবের জঘন্যতার প্রতীক ও ভরতকে অসভ্য, মূর্খ আখ্যা দিয়ে রামায়ণের পরিণতির তাৎপর্যকে অসংগত স্থূল রূপে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে রামায়ণের প্রকৃত রচয়িতা'কে' এ নিয়ে বিতর্কের উপস্থাপন করেছেন।

বাল্মীকির রামায়ণ কৃত্তিবাস থেকে সংকলিত নাকি কৃত্তিবাস বাল্মীকি থেকে সংকলিত করেছেন এ মীমাংসায় উপনীত হতে না পেরে বিদেশী পন্ডিত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

'রামায়ণ' শব্দের সংস্কৃত কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গলায় সদার্থ হয়। বোধ হয় 'রামায়ণ' শব্দটি 'রাম' সবন' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র কেবল 'ব'- কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা সবন না রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া বাল্মীকি মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।" (বঙ্কিম রচনাবলী ১৩৬১, পৃ ঃ ২৮)

'রামায়ণ' কে আদ্যোপান্ত অশ্লীলতায় পতিত কাহিনী এবং নবম রসে মহাকাব্য, রামায়ণে বানর দল কর্তৃক 'সমুদ্র বন্ধন'কে করুণ রস হিসেবে চিহ্নিত করে লক্ষ্মণ চরিত্রকে বীর রসের চরিত্র হিসেবে অভিহিত করে

Dhaka University Institutional Repository

ঋষিদের ধর্ম নিয়ে হাস্য পরিহাসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রামায়ণের ভাষাকে প্রাঞ্জল ও বিশদ রূপে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এ অশুদ্ধ প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচনা লক্ষণীয়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতের অধিকারী এই বাক্যের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত বিদেশী পণ্ডিতের মূর্খতাকে সবিশেষ ব্যঙ্গবাণে বিদ্রূপ করেছেন

"বর্ষ সমালোচনা"- অংশে বিগত বৎসরের পর্যালোচনা উপস্থিত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছেন। এমনকি গত বৎসরের বৃষ্টি দেশের সব জায়গায় না হওয়ায় মেঘের পক্ষপাতের কথা সরস বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

"গত বৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, যে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেন্টে এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয় এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমেটি সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবে না- কেন না, বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনী প্রিয়-সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভে ও দেশ দেশান্তর যাইতে স্বীকার করিবে না "

(বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৬১, পৃঃ ৩০)

"Bransonism"-অংশটি ilbert বিল সম্বন্ধীয় বিবাদকালে লিখিত। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের বিচার ব্যবস্থা দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কথোপকথন পদ্ধতিতে আইনের জেরার বিবৃতিতে কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"হনূমদ্বাবাবু সংবাদ" অংশে নব্যবাবু সম্প্রদায়ের জনৈক প্রতিনিধির হনূমানের সঙ্গে কথোপকথনে মাতৃভাষার প্রতি বিরাগ দৃষ্টি ইংরেজ অনুকরণের অপচেষ্টা কৌতুককর আচরণে বিবৃত হয়েছে ইংরেজ বেশ, ইংরেজী বুলি সত্ত্বেও মূর্খতায় পাহাড় সমান নব্যবাবু হনূমান কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার দৃশ্যটি মনোরম। বঙ্কিমচন্দ্র বাবু সম্প্রদায়ের বিবৃত সাজ-সজ্জা স্বদেশ ও স্বজনদের প্রতি বিতৃষ্ণ মনোভাব মেনে নিতে পারেন নি এ জন্যে এই অংশটির সৃষ্টি হয়েছে।

"গ্রাম্য কথা" পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণ পাঠদানের কৌতুককর ঘটনা বিবৃত হয়েছে পণ্ডিত মহাশয়ের স্বল্প-সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান শ্লোকের মাধ্যমে গ্রাম্য নারীর ও শিক্ষার্থীদের নিকট পণ্ডিত রূপে চিহ্নিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এ ধরনের পণ্ডিতের নাজেহাল অবস্হার চিত্র অঙ্কন করেছেন ।

"ভোঁদার মা ! বাবা ! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তাটির কিছু হলো না কেন ? ঝাঁটা বল, কোস্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না। পণ্ডিত ! বাছা ! ওসব কি তোমাদের হাতে হয় ? ও আমাদের হাতে !

ভোঁদার মা ! বাবা ! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই । দেখিবে ? এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল । পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয় আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ-ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে "মা , এক বাকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।" (বঙ্কিম রচনাবলী ১৩৬১, পৃ ঃ ৪২)

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিশীলিত রুচিবোধ, ও যুক্তিবাদী ধর্মবোধ তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ ধর্ম এষণা থেকে উত্তীর্ণ করেছে। এজন্য ব্রাহ্মপ্রথার ধর্মশিক্ষা অংশে ব্রাহ্ম সমাজের অশিক্ষিত পিতামাতার সন্তানের ধর্মশিক্ষার হাস্যকর চিত্র অঙ্কন করেছেন। ধর্মশিক্ষা নীতিহীন পিতার সন্তানকে গ্রাম্য পরিবেশে মার্জিত করে তুলতে ব্যর্থ হয়। তার নিদর্শন আলোচ্য অংশে-

"ছেলের । বাবা, " আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"- ওতে আমাদের কি তফাৎ আছে ? এর নাওয়াতেই আমারে নাওয়া হয়েছে । এখন সন্দেশ দাও।

পিতা বেত্রহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন। পুত্র পালাইতে পালাইতে বলিতে লাগিল, বাবা শাস্ত্র জানে না।" কিছু পরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন যে, সে ও পাড়ায় শিরোমনি ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমনি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার একি করেছিস ? "ছেলে । কি করি বাবা ! তুমি ত ছাড়বে না বেত মারিবেই মারিবে। তাই আপনা আপনি যেই বেত খেয়েছি। পিতা ঃ সে কি রে বেটা ? আপনা আপনি কি ? শিরোমণি ঠাকুরকে মেরেছিস যে ? পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন ছেলেকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ৪৪)

মূলত 'লোকরহস্য' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন নব্য সমাজের বিচিত্র অসঙ্গতি কখনও পশু প্রতীকে, কখনও আবার সাধারণ মানুষের বিকৃতিতে ব্যঙ্গ করে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালী সমাজে কৌতুককর ঘটনা ও চরিত্র বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ শরে উন্মোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'কমলাকান্তের দপ্তর' কমলাকান্তের পত্র' 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী,'- এই তিনটি অংশ নিয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'। 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয়- ১৮৭৫খ্রীঃ । ১৮৮৫ খ্রীঃ 'কমলাকান্তের' নামকরণে উপরিউক্ত তিনটি অংশে সম্মিলিত ভাবে প্রকাশিত হয়। কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৯খ্রী ঃ। 'ঢেঁকি' নামক প্রবন্ধটি নতুন সংযোজন হয়। ' লোকরহস্য গ্রন্থে লেখক মানব চরিত্র সম্পর্কে প্রবহমান সংসার ও সমাজের উপরিস্তরের চিত্র এঁকেছেন। অন্যদিকে অর্ধ উন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের মুখ দিয়ে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্য, সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করেছেন।

''সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সংকোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসংকোচে বলিতে পারিতেন এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত জন্মের ইহাই ইতিহাস।''(বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ১৭)

গুরুতর জীবন সত্যকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্ত গভীর অসঙ্গতি ও বিকৃতি সাধারণের চোখে পড়ে না তা ব্যঙ্গ শিল্পী মানব সমাজের একজন হয়েও নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে নির্বিকারভাবে তুলে ধরেন। আর হিউমারিষ্ট নিজেকে দশের একজন বলে মনে করেন পৃথিবীর অসঙ্গতি ও বিকৃতি দেখে, জীবনের আদর্শের অপমৃত্যু, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস প্রভৃতি হিউমারিষ্টের চোখে সুখ দুঃখ যেন রসিকতা বলে মনে হয়। কমলাকান্ত হিউমারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এ গ্রন্থে লেখক রসিকতার ও ব্যঙ্গের স্রোতোধারার নীচে কান্নার অশ্রু বিন্দু সংযুক্ত রেখেছেন। সমালোচকের ভাষায়-

Dhaka University Institutional Repository

"বঙ্কিমচন্দ্রের হিউমারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত" কমলাকান্তের দপ্তর" ইহা যে শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়া অনবদ্য শুধু তাহাই নহে, ইহাতে লেখকের আত্মরূপ ও পরিস্ফুট হইয়াছে। কমলাকান্ত স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের মত ও আদর্শ, হাসি ও বেদনার সহিত তাঁহার পরিপূর্ণ একাত্মতা রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি রূপের মধ্যে একটি বিরোধিতা যে লক্ষ করা যায় তাহা সত্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল ব্যক্তিত্ববান, প্রখর মর্যাদাসম্পন্ন, সদা সক্রিয়া এবং কথায় ও আচরণে কঠোর সংযমনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত ভবঘুরে, ছন্নছাড়া নেশাখোর কমলাকান্তের সঙ্গতি কোথায়? কিন্তু সঙ্গতি না থাকলে ও মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য জীবনের অভিনব রসমন্ধবনী হইয়া তাঁহার ভদ্র মার্জিত, নিয়ম ও সংযম বেষ্টিত আত্মস্বাতন্ত্রের নির্মোক খুলিয়া ফেলিয়া জীবনের উপেক্ষিত, অসংলগ্ন উৎকেন্দ্রিকতার স্তরে নামিয়া আসিলেন। বিচারক কাঠাগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, শাসনের দন্ডটি কৌতুকের যাদুদন্ড হইয়া পড়িলে, সেই তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল এবং চাপা অধরোষ্ঠের ভিতর হইতে স্নিগ্ধ হাসির প্রসন্ন দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল।"

(ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ১৩৬৭, পৃঃ ৩১৫।

ব্যঙ্গের ছদ্ম আবরণের অন্তরালে এক সুগভীর জীবন দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছেন "কমলাকান্তের দপ্তরে" মানবজীবনের প্রকৃত সত্য রহস্য উপলব্ধি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে রূপায়িত। 'কমলাকান্ত' রচনার পেছনে রয়েছে সমকালীন সমাজ জীবনের নানা মাত্রিক সংকট, বিদেশী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক আরোপিত জীবনের সংকট, আদর্শগত দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, প্রচলিত রাজনীতি ও জীবন যাপনের সকল দিক অসামঞ্জস্য সংকট পূর্ণ ও বিরোধময় হয়ে উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন জীবন সমাজ রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক সংকটের চরম মুহূর্তে 'কমলাকান্ত' গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৬২ সালে পৈত্রিক সম্পত্তি বঞ্চিত হলে তাঁর আপন ভাইদের সঙ্গে পারিবারিক দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ১৮৭৫ সালে 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সালের শেষের দিকে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যায় । ১৮৭৪ সালে বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল ড্রাফিং- এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কলহ হয়। অফিস থেকে বাড়ি ফিরবার সয় উক্ত কর্ণেলের দ্বারা লাঞ্ছিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী নালিশ করেন। এই মামলার প্রেক্ষিতে প্রকাশ্য আদালতে কর্ণেল ক্ষমতা প্রার্থনা করলে তিনি মামলা প্রত্যাহার করেন। উপনবেশিক রাষ্ট্রীয় জীবনের শূন্যতা এবং পরিবারিক জীবনের সংকীর্ণতা বঙ্কিমচন্দ্রকে নিঃসঙ্গ আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন করে

"তৎকালীন বিক্ষুব্ধ সমাজ পরিবেশে, যখন বিদেশী শাসনে কর্তৃক্ষের বিরুদ্ধে আশ্বাস ও সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, যখন পরাধীনতার চেতনা উন্মোচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কালবৈশাখীর মত ক্ষুব্ধ আবহওয়ায় ব্যক্তি জীবনের এই দুর্ঘটনাকে জাতীয় অপমানের ক্ষতচিহ্ন স্বরূপ গণ্য আরম্ভ অথবা অবান্তর নয়। যাহা হউক, এই বেদনা, এই লাঞ্ছনা, শূন্যতা ও ক্ষোভ, কালবৈশাখীর উদ্দম বেগে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এ ভাঙ্গিয়া পড়িল।" (অরবিন্দ পোদ্দার, ১৩৫৮, পৃ ঃ ৭৪)

কমলাকান্ত আফিম খায়, চার পায়ের উপর বসে ঝিমায়, নানা উদ্ভট কথা চিন্তা করে প্রকাশ, মঙ্গলগাই ও প্রসন্ন গোয়ালিনী ছাড়া সংসারের কারো সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, সে অফিসে সাহেবের মনোরঞ্জন করতে জানে না অফিসের কাগজপত্রে কবিতা লেখে ও ছবি আঁকে, চাকুরীচ্যুত হওয়ার পরও নিশ্চিত জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। লক্ষ্যহীন ভাবে নিরাসক্ত আত্মীয় পরিজনহীন সংসার বিমুখ কমলাকান্ত। নেশাখোর বাতিকগ্রস্ত কমলাকান্ত অসংলগ্ন উক্তির মাধ্যমে জীবন ও জগত সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে। কমলাকান্ত অহিফেন সেবন করে সমাজ জীবনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে এবং সমাজ জীবনে বিবিধ অসঙ্গতি ব্যঙ্গবাণে, উপহাসে, কৌতুকে উপস্থাপন করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

কমলাকান্ত রাষ্ট্র, সমাজ ব্যাধির শিকার। এই জন্য গোটা সমাজের সঙ্গে তার বিরোধ, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ, সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তার আক্রোশ, তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংঘাত, প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব এই বিচিত্র প্রবণতা বিচিত্র দৃশ্যে অভিব্যক্ত। কমলাকান্ত গ্রন্থে বিচিত্র অংশ গুলো নিম্নরূপঃ ১। 'কে গায় ওই' ২। 'মনুষ্যফল ৩। ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' ৪ 'পতঙ্গ' ৫। 'আমার মন' ৬। চন্দ্রালোকে' ৭। বসন্তের কোকিল, ৮। স্ত্রীলোকের রূপ। ৯ 'ফুলের বিবাহ' ১০। 'বড় বাজার' ১১। 'আমার দূর্গোৎসব' ১২। 'একটি গীত' ১৩। 'বিড়াল, ১৪। 'ঢেঁকি'

কমলাকান্ত নিপুণ পরিহাস, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বাঙালী সমাজ জীবন ও বিচিত্র চরিত্রকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হয়েছে নব জাগরণের সূত্রপাতে রক্ষণশীল সমাজের কাছে অনেক কিছুই ছিল ব্যঙ্গের কারণ অন্যদিকে পরিবর্তিত সমাজ জীবনের নব্য বঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনে এনেছিল বিচিত্র প্রবণতা। বঙ্কিমচন্দ্র এই আর্থ-সমাজের পটভূমিতে ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কমলাকান্তের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ সৃষ্টি হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সৃষ্টির পশ্চাতে সুগভীর জীবন মূল্যবোধ সক্রিয় ছিল। তাঁর ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য এবং কখনও কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচার ও অনাচারের বিপক্ষে তাঁর লেখনী সজাগ ছিল।

কমলাকান্ত নিঃসঙ্গ, একা জনবহুল নগরীর আনন্দময় জনস্রোতে কমলাকান্ত নিঃসঙ্গতা পীড়নে দগ্ধ হয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থ হয় কমলাকান্ত। সুখের অস্তিত্ব অন্বেষণ করে কিন্তু সময় ও সমাজের বিপরীত মুখী অবস্থার প্রেক্ষিতে মানব জীবন থেকে সুখ অন্তর্হিত হয়েছে। তাই সে আফিমের মাত্রা বৃদ্ধি করে, মানুষকে খলরূপে চিহ্নিত করে ব্যঙ্গ করে।

"আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আরাম বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল বিশেষ মায়াবৃক্ষে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না, কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া

Dhaka University Institutional Repository

যায়. কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্‌রায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে. কোনটি সুপক্ক হইয়া , আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেব সেবায় ব্রাহ্মণ ভোজনে লাগে, তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায় : তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায় কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়, যে খায় সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয় কেবল দেখিতে সুন্দর।" (মলাকান্তের দপ্তর/মনুষ্যফল/ বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ৫১)

মানুষ ফুল, ফল, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ থেকে নেমে পশু, পাখী, ফল মূলের সমগোত্রীয়ে পরিণত হয়েছে। কমলাকান্ত সিভিল সার্ভিস সাহেবের আম্রফল, নারীদের নারিকেল-সংসারের নারিকেল, অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের সংসারের ধূতরা ফল এবং লেখকদের তেঁতুল ফল বলে গণ্য করেছে। দেশী হাকিমদের পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড বলে চিহ্নিত করেছে। মানুষের পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ফলের নাম ব্যঙ্গের অন্যতম নিদর্শন

বাঙালী সমাজে ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে যে আলোড়ন ও সচেতনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তার পশ্চাতে ছিল তুচ্ছতা, মূর্খতা, সংকীর্ণতার দৃষ্টিভঙ্গি । বাস্তবজীবনে অন্তঃসার শূন্য কমলাকান্তকে পীড়িত করেছে। তার 'ইউটিলিটি বা উদর দর্শন'- অংশে বেন্থামের হিতবাদ 'উদরপূর্তির' বা 'উদরদর্শন'- সমসূত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, বাসনা, বল এবং প্রতারণা এই ষড়বিধ নিয়মাবলী উদরপূর্তির জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন হিতসাধন ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা ইউরোপীয় জাতি, রুশজাতি, মানবজাতির হিত সাধনে নিযুক্ত। বিচারকরা ও দেশ হিতসাধন করেছেন। এভাবে কমলাকান্ত বেন্থামের হিতবাদ দর্শন ভেঙ্গে গড়ে 'উদরদর্শনে' পরিণতি দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কমলাকান্তের মতে মানুষ মাত্রেই 'পতঙ্গ'। কারণ কাচময় সংসারে মানুষ জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়বহ্নি যে কোন একটিতে পুড়ে মরতে চায়। কেউ আবার আলো দেখে মোহিত হয়ে ঝাঁপ দিতে চায় কিন্তু আলো না পেয়ে প্রত্যাবর্তন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্তী জন্ম গ্রহণ করেন। নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় ঝিমাতে ঝিমাতে নিজেকে ও মানব জাতিকে পতঙ্গ জাতি হিসেবে উপলব্ধি করেন। আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হয়ে কমলাকান্ত পতঙ্গের মুখে শ্রবণ করেছেন সামাজিক অবস্থার সারঃসত্ত।

"দেখ পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে আমাদের চিরকাল হক। আমরা পতঙ্গ জাতি, পূর্ব্বপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি- কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাঁচ মুড়ি দিয়া আছ কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে পুড়িয়া মরিতে পাব না ?" (বঙ্কিমরচনাবলী পৃ ঃ ৫৭)

কমলাকান্ত নিজের মন অন্বেষণ করেন, কিন্তু তার অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। সে সুখী নয় কারণ সে চিরকাল নিজের থেকে গেছে পরের হয়নি। পরের জন্য আত্মবিসর্জনে পৃথিবীতে স্থায়ী সুখ সম্ভব। তৎকালীন নব্য ধনিক শ্রেণীর বিস্তর ও বাণিজ্য পুঁজির প্রসার বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য মঙ্গলকর হয়নি। ইংরেজী শাসন, ইংরেজী সভ্যতা, ও ইংরেজী শিক্ষা মানুষকে বাহ্য সম্পদের উপর অনুরাগী করেছে। বর্তমানে সভ্যতার এই আত্মকেন্দ্রিক অবস্থা মানব জীবনে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। কমলাকান্তের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মেরুদূর পার্থক্য তাকে অনুক্ষণ পীড়িত করেছে তার আকাঙ্ক্ষা বেদনায়সিক্ত হয়ে কৌতুক রসে ব্যক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"হর হর বম বম । বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা। টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি ! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে ! বম্ বম হর হর ! টাকা বাড়াও , টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর ! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর, শূন্য হইতে টাকা সৃষ্টি হইতে থাকুক ! টাকার ঝন-ঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক ! মন ! মন আবার কি ? টাকা ছাড়া মন কি ? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই ! টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে । টাকা বাহ্য সম্পদ । হর হর বম বম । বাহ্য সম্পদের পূজা কর ।" (বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ৬১)

চন্দ্রকে সম্বোধন করে কমলাকান্ত নিজের বিবাহের ইচছা পোষণ করে বাস্তব জীবন ও সংসারের অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। নারী পুরুষে ভেদাভেদ এবং পৃথক শ্রেণীভুক্ত সামাজিক জীবনে যে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তার বিরুদ্ধে কমলাকান্ত নতুন মাপকাঠি প্রণয়ন করতে চায়। দেহগত ও চরিত্রগতভাবে মানুষ স্ত্রী পুরুষের বিভাজন করে থাকে, এমন কি পুরুষে পুরুষে প্রভেদ নির্ণয় করা হয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান পরিচয় নির্ণীত হয় সাফল্য ও সামাজিক মর্যাদার বদৌলতে। কমলাকান্তের সঙ্গে সংসারের অন্য লোকদের মতামতের সঙ্গে ভিন্নতা লক্ষ করা যায় কমলাকান্তের ব্যঙ্গ দৃষ্টি নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছে

"সে ওয়াজিদালি শাহা লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চর্তুদ্দোলা রোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপ পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সমৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হিনা শী ? এবং যে মহিষী দেশ বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া রাজ পুরুষগণের সরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়র বোধে, নেপালে পর্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি ? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না

Dhaka University Institutional Repository

তবে বৃদ্ধ নৈপুণ্য হি-শীর প্রভেদ হইবে ? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দূর্গ আক্রমণ কালে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করিয়াছিল যে ফ্রান্সের পুররুদ্ধার করিয়াছিল , তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? "

(বঙ্কিমরচনাবলী ১৩৬১ পৃ : ৬৪)

কমলাকান্ত পৃথিবীর আপাত সৌন্দর্যে মানুষের মুগ্ধ হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। 'বসন্তের কোকিল' পঞ্চম স্বর তাকে বাস্তব জীবনের চালবাজ, গলাবাজ ও ধূর্ত লোকের কথা মনে করে দিয়েছে। সে লিখেছে যেমন বসন্তের কোকিল পঞ্চম স্বরের মাধুর্যে কালো রং ঢেকে রাখে, তেমনি গলাবাজির জোরে গ্লাডস্টোন, ডিসরেলি, মেকালে প্রমুখ শূন্য গর্ভতা ঢাকা পড়ে। জন স্টুয়ার্ড মিল পার্লামেন্টে বেশীদিন সদস্য থাকতে পারেননি। জেমস মাকিন্টশ অপেক্ষা অলঙকার শাস্ত্রবিদ মেকালে অধিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন। গ্লাডস্টোন, ডিসরেলি রাজমন্ত্রী হয় গলাবাজির জোরে।

বাস্তবজীবনে অযোগ্যরা কিভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তার দৃষ্টান্ত 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে' প্রাপ্য এ ক্ষেত্রে কমলাকান্তের দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়।

'স্ত্রীলোকের রূপ' অংশে কমলাকান্ত স্ত্রী জাতির রূপও সৌন্দর্যের প্রশংসা করে নারী জাতিকে সঠিক মূল্যায়নের পন্থায় চিহ্নিত করেছে । রূপ ও সৌন্দর্যে যৌবনের বাহার কিন্তু নারীজাতির রূপ অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ভক্তি ও প্রীতি অধিকতর কাম্য। কমলাকান্ত বাঙালী সমাজে নারীর অবস্হান বর্ণনা করতে গিয়ে তার প্রত্যাশিত আকাঙখার কথা উচ্চারণ করেছে। "মনুষ্যফল" প্রবন্ধে নারীজাতির সম্পর্কে যে কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে নারীর সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধতা প্রকাশিত হয়ে ওঠে। মূলত আলোচ্য অংশে কমলাকান্ত পূর্বোক্ত বক্তব্যের পূর্ণর্বিবেচনা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'ফুলের বিবাহ' প্রবন্ধে মল্লিকা ফুলের বিবাহ প্রসঙ্গে বিবাহ ইচ্ছুক বর কনে কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কৌতুকপূর্ণ রচনা। কমলাকান্ত বাঙালী বিবাহ রীতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই কৌতুককর রচনায় তুলে ধরেছে বাঙালীর বিবাহের জাত, কুল, বর্ণের ও ঘটকালীর বিচিত্র প্রসঙ্গ কমলাকান্তের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে

"গোধুলী লগ্ন উপস্থিত, গোলার বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল, মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল, আকাশে তাঁরাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল অনেকে বরযাত্রা চলিল ; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী শ্বেত জবা রক্তজবা, জরদ জবা প্রভৃতি সব্বংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল সেকেলে রাজদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল-বেটা ব্রান্ডি টানিয়া আসিয়াছিল উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া গন্ধ বিলাইয়ার দেশে মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিতঃ সঙ্গে এক পাল পিপড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে ; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড় কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্রা জোটে, আর কোন বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাঁধায় ? করু বক কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্রা আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন ।" (বঙ্কিমরচনাবলী,৩৬১ পৃঃ ৭৪)

কমলাকান্ত বন্ধনহীন, মায়াবিচ্ছিন্ন, বৃন্তহীন হলেও বৃক্ষ থেকে অবিচ্যুত । আফিমের মাত্রা চড়লে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মন মানব সংসারের বিচিত্র বিষয়ে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আদর্শহীন, নীতিহীন জীবন-যাপন তার দৃষ্টিতে উপহাস ও ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে ওঠে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঙ্গকারের নির্লিপ্ত স্বভাব সক্রিয় হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রখরতায় রূপ ধারণ করে। কমলাকান্ত এই ব্যঙ্গকারের দৃষ্টি প্রযুক্ত করে মানব চরিত্রে অবলোকন করেছে স্বার্থপরতার কলঙ্কিত রূপ। সব কিছুই অর্থ মূল্যে বিনিময় হয়। নারীর রূপ সজ্জা, পণ্ডিতের বিদ্যাদান, ইংরেজের রাজ্য শাসন, সাহেবদের সংস্কৃত গবেষনা, উমেদওয়ারের উমেদওয়ারি, সাহিত্যিকের সাহিত্যচর্চা, যশলোভীর যশের আকাঙ্খা, বিচারকের দন্ড বিধান সর্বত্র কমলাকান্ত ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক দেখতে পায়। 'বাজারের' বিভিন্ন অংশে পরস্পর বিরোধী বিষয়ের উপস্থিতি তার দৃষ্টিতে কৌতুককর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে দেখেছে অজস্র দোকান, অজস্র খরিদদার এই বিশ্ব সংসারে পরস্পর পরস্পরকে 'অঙ্গুষ্ঠ' দেখাচ্ছে। কমলাকান্ত প্রথমে রূপের দোকানে প্রবেশ করে দেখতে পেয়েছে পৃথিবীর রূপসীরা মাছ হয়ে ঝড়ি ঝুপড়ির ভেতর প্রবেশ করেছে। ছোট বড় রুই কাতলা, কই মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আঁচড়িয়ে ছটফট করছে মেছুনীর প্রত্যেক মৎস্য ধর্মী আচরণের খরিদ্দারদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রচেষ্ঠায় নিয়োজিত রূপের বাজার ছেড়ে কমলাকান্ত বিদ্যার বাজারে ব্রাহ্মাণ পণ্ডিতদের ফলমূল বিক্রি করতে দেখেছে। ঝুনা-নারিকেল পন্ডিতদের একমাত্র অবলম্বন। পদার্থতত্ত্ব এই নারিকেলে লভ্য। পরবর্তীকালে ইংরেজ সাহেবদের এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকানে কমলাকান্ত দেখেছে বিচিত্র ফল বিক্রয়ের প্রচেষ্টা। এক নম্বর এক্সপেরিমেন্ট ঘুষি ইংরেজ দোকানদারদের ব্যঙ্গ করে কমলাকান্ত তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা তথা ব্রিটিশ সাহেবদের অবিচার-অন্যায়কে তুলে ধরেছে।

"অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে।" আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম এমত সময়ে সহস্য দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে, ক্রুদ্ধ বেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া নামাবলি ফেলিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া সুখে আহার করিতে

Dhaka University Institutional Repository

লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "এ কি হইল ? সাহেবরা বলিলেন" ইহাকে বলে Asiatic Rescarchers." আমি তখন ভীত হইয়া আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researcher আশংকা করিয়া সেখানে হইতে পলায়ন করিলাম", (বঙ্কিমরচনাবলী,১৩৬১ পৃ ঃ ৭৮)

কমলাকান্ত সাহিত্যের বাজারে দেখতে পেয়েছে বাঙলা সাহিত্যের দুর্দশা। বাঙলা সাহিত্যের দোকানে অসংখ্য শিশু অবলাগণ ভিড় করেছেন। কিন্তু কমলাকন্ত বিক্রয় পদার্থ দেখতে গিয়ে দেখতে পায় খবরের কাগজে জড়ানো অপক্ক কদলী অর্থাৎ বাঙলা ভাষা সাহিত্যের অর্থহীন আবর্জনা। কমলাকান্ত যশের যশলোভী পণ্য শালায় যশ আকাঙ্ক্ষিত মানুষের বিচিত্র আচরণ দেখেছে । এ সব সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিষয়াবলী কমলাকান্তের পর্যবেক্ষণে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কমলাকান্ত এ দেশী বিচার ব্যবস্থায় দেখেছে কসাইখানার মত অব্যবস্থা । বিচারের বাজার ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে উন্মোচিত।

"বিচারের বাজারে গেলাম, দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায় ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোর কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশু সকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে ; ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, এত গোরু কাটিতে হইবে। আমি সেলাম করিয়া পালাইলাম।"

(বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ৭৯)

কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম আত্মপ্রকাশ করেছে। গভীর জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক জীবনে বাঙালী জাতির হীনমন্যতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর "লোকরহস্য" 'হনূমদ্বাবু সংবাদ' অংশে বাঙালী সমাজের ব্যঙ্গচিত্র অংকিত হয়েছে। বাঙালীর ইতিহাস ও দেশপ্রেমের প্রধান উৎস আমার দুর্গোৎসবে বর্ণিত কমলাকান্ত দেশলক্ষ্মী ও দেশ পূজা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উদ্দীপনা লাভ করেনা

Dhaka University Institutional Repository

জননী জন্মভূমি পতিত সূর্য বর্তমানে শত্রুর পদতলে নিষ্পেষিত ব্যঙ্গ প্রতিমা পদতলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে কমলাকান্ত তার সপ্তমী পূজার পর্ব সাঙ্গ করেছে।

'একটি গীত'- নিবন্ধে কমলাকান্ত ইতিহাসের আলোকে মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধপ্রকাশ করেছে এই অংশে কমলাকান্ত তার আকাংখা লোকবাৎসল্য দেশপ্রেমের আদলে ব্যঙ্গ করেছে । আমার দুর্গোৎসবে সে হিন্দুদেরকে দেশমাতৃক প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে তারই আদর্শগত রূপ 'একটি গীত' অংশে দেখানো হয়েছে

''কমলাকান্ত ব্যক্তিগত প্রেমোন্মদ (অথবা ধর্ম্মোন্মাদ) কে হৃত স্বদেশ লক্ষ্মীর জন্য দেশভক্তের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করিয়াছে। ব্যঙ্গ ভাগ্যে ভবিষ্যতে আর যাই আশুক, হিন্দু রাজত্বের পুনরুদ্ধার হইবে না তাই যে রাজলক্ষ্মী ১২০৩ সালে এই দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যিনি আর কখন ও আসিবেন না, কমলাকান্ত তাঁহাকেই বধূরূপে কল্পনা করিয়া নানাভাবে আহবান করিয়াছে এবং বাঙালী হিন্দু যে যে দোষের জন্য তাঁহাকে হারাইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্ত করিয়া দেশাত্মবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। বৈষ্ণব কবির গান অসাধারণ বিস্তৃতি পাইয়াছে এবং স্বদেশ-প্রীত বিরহিণী নায়িকার দুর্নিবর আকাঙক্ষার সঙ্গে মিলিত হইয়া অপরিসীম তীব্রতা ও করুণতা লাভ করিয়াছে। কমলকান্তের কল্পনা বৈষ্ণব কবিতার সীমাবদ্ধ পরিবেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীন বঙ্গের হিন্দু সভ্যতার এবং সেই সভাতা বিলোপের মধুর স্বপ্নচিত্র রচনা করিয়াছে। ''(সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ ঃ ১৩০)

সমাজ ও সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক 'সাম্য', বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিন্তা সমূহ অভিব্যক্ত হয়েছে তারই ব্যঙ্গরূপে 'বিড়াল' নিবন্ধে প্রকাশিত । সাম্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ধনী দরিদ্রের ধনি বৈষম্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা উপস্থাপন করেছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে 'বিড়াল' প্রবন্ধে এক বৎসর

Dhaka University Institutional Repository

পর ধনী দরিদ্রের ধন বৈষম্য সমাজ ও রাজনীতির অসঙ্গতি তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রোপে তুলে ধরেছে কমলাকান্তকে 'বিড়াল' বলেছে মানবজাতির প্রবণতাই হল তেলার মাথায় তেল দেওয়া। দরিদ্রের ক্ষুধা কেউ বুঝেনা। দরিদ্র যদি ক্ষুধার জ্বালায় কারো খাদ্য খেয়ে ফেলে তাহলে তাকে অভিহিত করা হয় চোর হিসেবে। কমলাকান্ত বলেছে যে বিড়াল দুধ চুরি করে সে মূলত 'সোসালিষ্ট' যে মানুষ বিড়ালকে তাড়িয়ে দুধ রক্ষা করে সে মূলতঃ 'ক্যাপিটালিষ্ট' কমলাকান্ত সুদুর প্রসারী দৃষ্টিতে আঘাত দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বাঙালী সমাজের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে।

"দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতে ও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে-চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দন্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ তাহার দন্ড হয় না কেন?" (বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১পৃঃ৮৬)

কমলাকান্ত 'ঢেঁকি' শালে গিয়ে দেখতে পেয়েছে জমিদার, প্রজা, ধনী-দরিদ্র আইন কারো বিচারক, বাবু, লেখক সকলেই 'ঢেঁকিশালে' পিষ্ঠ হচ্ছে এবং নিজেরা পিষছে। সমাজে সাহিত্যে, ধর্ম্ম সংসংস্থায়, রাজ সভায় 'ঢেঁকি' সভ্যতার মুখ উজ্জ্বলকারী পুত্র, ঢেঁকির অপরিমেয় মাহাত্ম্য অনুসন্ধানে কমলাকান্ত সচেষ্ট হয়েছে। আফিম চড়িয়ে জ্ঞাননেত্র উদয় হলে কমলাকান্ত দেখতে পায়।

"এ সংসার ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি গড়ে নাক পুড়িয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিন্ড গড়ে পিষিয়া, নতুন

Dhaka University Institutional Repository

নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন। আইন বিচারক ঢেঁকি সেই আইন গুলিগড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছ-দারিদ্র্য, কারাবাস-ধনীর ধানান্ত ভাল মানুষের দেহান্ত ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন-পিলে যকৃৎ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন-অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি-সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুন্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন-স্কুলবুক! "

(বঙ্কিমরচনাবলী পৃ ঃ ৮৯-৯০।

কমলাকান্ত দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি সাহিত্য প্রভৃতি অনুষঙ্গ নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন তারই পরবর্তী পর্যায় 'কমলাকান্তের পত্র'। কমলাকান্ত পাঁচটি পত্রে সমাজ, রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যঙ্গ করেছে । বাঙালীর পলিটিকস্ সে কুকুরের পলিটিকস্ এর সঙ্গে তুলনীয় বিসমার্ক এর পলিটিকস্ বৃষের সঙ্গে এবং বাঙালীর রাজনীতির অসামঞ্জস্য বিচিত্র অনুষঙ্গ কমলাকান্তের ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী যে জাতিকে জয় করেছিল তাদের কোন পলিটিকস নেই কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদের দিব্য চক্ষু লাভ করে দেখেছে।

"এই পলিটিকস্-এই কুক্কুরও পলিটিশান ! তখন মনোনিবেশ-পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল কুক্কুর দেখিল-কলুপুত্র কিছু বলে না- বড় সদাশয় বালক, কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হা-হা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং মন মন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল, এজিটেশান সফল হইল ঃ কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া

Dhaka University Institutional Repository

চুষিয়া লইয়া কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ লেহন, গেলন এবং হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষুবুজিয়া আসিল।" (বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃঃ ৯৩-৯৪)

ভোজনবিলাসী আফিম খোর কমলাকান্ত দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখেছে এক কক্কুর জাতীয় আর এক বৃষ জাতীয়। বিসমার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দলের পলিটিশান-আর উলসি হতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশান। রাজনীতির মত কমলকান্ত বাঙালীর মনুষ্যত্ব, সম্পর্কে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছে। ভ্রমরের কথোপকথনে কমলাকান্ত বাঙালীর মনুষ্যত্ব সম্পর্কে কটাক্ষপাত করেছে। ভ্রমর ক্ষুদ্র 'পতঙ্গ' হওয়া সত্ত্বেও এবং তার স্বভাব ঘ্যান্ ঘ্যান করা হলেও সে মধুও সংগ্রহ করে। কিন্তু বাঙালীর ঘ্যান-ঘ্যানানি ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা নেই। দু'চারটি ইংরেজী বুলি শিখে বাঙালী বাবু উমেদওয়ারির জন্য ঘ্যান ঘ্যান্ করে বেড়ায়। উকীল, সরকারী বড় জজ,ছোট জজ, সাব-জজ, ডেপুটি, মুন্সেফ সকল পেশার লোকই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে অভ্যস্ত অর্থাৎ বাঙালী কাজে নয় কথায় বড়। এই অনিবার্য বিষয়টি বাঙালীর মনুষ্যত্ব প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। "তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই কেবল কাঁদুনে মেয়ের যত দিবারাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও- তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। 'মধু করিতে শেখ- হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশংকিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্তে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল ! সে; যাকং মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকন্ডুয়ন রোগ জন্য কাকে মন যায়না জিবে কাষ্টকি দিয়া যা কর অগত্যা কাজে মন যাইতে পরে আর শুধু ঘ্যান ঘ্যান ভাল লাগে না।" (বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

বুড়ো বয়সের কথায় কমলাকান্ত অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের কথা পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে বলেছে । যৌবনে যার প্রত্যাশা ছিল, ভালবাসার জগত ছিল আলোময়, যার বক্তৃত্বে অন্যেরা কত আনন্দিত হত তার এখন অসীম নিঃসঙ্গতা । যৌবনই কেবলমাত্র বিষয় চিন্তার বয়স নয় বার্ধক্যে বিষয়চিন্তা থাকতে পারে কমলাকান্ত বার্ধক্যে আপনার কাজ শেষ হলে পরহিতের ব্রত গ্রহণ করেছে । কারণ মানুষের স্বার্থপরতার সীমা নেই কালীদাস, বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি উপাধী প্রদান করেছেন। কমলাকান্ত মনে করে-

"বিসমার্ক মোলটকে ও ফ্রেডেরিক বুড়াঃ তাহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে-জর্ম্মান ঐকজাতা কোথা থাকিত ? টিয়া প্রাচীন টিয়ার মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণ তন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত ? গ্লাডস্টোন এবং ডিসরেলি বুড়া-তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিয়ামেন্টর রিফর্ম এবং আয়রিশ চার্চ্চের ডিসেস্টাব্লিশমেন্ট কোথা থাকিত ? (বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ৯৯)

মূলত কমলাকান্ত তার জীবনোপলব্ধি থেকে বুড়া বয়সের কথা বিবৃত করেছে। তার জীবনে না পাওয়ার বেদনা, সমাজ সভ্যতা, রাজনীতির বিপরীত স্রোত তাকে যে আফিম ও প্রসন্ন গোয়ালিনীর নির্ভরশীল করে তুলেছিল তার এখন সেই নসীরাম বাবু নেই । অহিফেনের অনটন, প্রসন্ন ও নিরুদ্দিষ্ট কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী । তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পরিহাস গভীর মানব প্রীতির রূপান্তরিত প্রকাশ

"সভ্য বটে, আমি তখনও একা এখনও একা এক সহস্র এখন আমি একায় আধখানা কিন্তু একের এত বন্ধন কেন ? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম কবে মরিয়া গিয়াছে-তাহার জন্য আজিও কাঁদি ; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম-কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি ! যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম- তাহার জন্য আজিও কাঁদি । কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী-তাহার এত বন্ধন কেন ? এ দেহ পচিয়া উঠিল-ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন ? ঘর পুড়িয়া গেল-আগুন

Dhaka University Institutional Repository

নিভে না কেন ? পুকুর শুকাইয়া আসিল এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন ? ঝড় থামিয়াছে- দরিয়ায় তুফান কেন ? ফুল শুকাইয়াছে- এখনও গন্ধ কেন ? সুখ গিয়াছে-আশা কেন ? স্মৃতি কেন ? জীবন কেন ? ভালবাসাস গিয়াছে-যত্ন কেন ? প্রাণ গিয়াছে- যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার অফিঙ্গের বরাদ্দ কেন ? বাঁশী ফাটিয়াছে-আবার যা, ঋ.গ.ম কেন ? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিশ্বাস কেন ? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন ? তবু কাঁদি । জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়া ছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাদিব, লিখিব না।" (বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃঃ ১০০-১০১)

মানুষের প্রতি প্রীতি ছাড়া কমলাকান্ত অন্য কোন সুখ প্রত্যাশা করেনা ! কমলাকান্তের সকল স্বপ্ন সব বাতিকের মধ্যে মানব জাতির প্রতি সুগভীর প্রীতি কখনও উচ্চ কবি-কল্পনায় উচ্ছ্বসিত আবার কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে সরস। 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'তে আদালতে বিচার পদ্ধতি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করেছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের আদালত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছিলেন কমালাকান্তের দপ্তরে 'বড় বাজারে' বিচারালয়কে কসাইখানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং 'মনুষ্য ফল'- অংশে হাকিম কুষ্মান্ড ফল। স্বার্থপর মানব সমাজ বিচারালয়ে বসেও মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, অর্থহীন প্রশ্ন উত্তর ও শূন্যগর্ভ আইন কানুন দ্বারা কন্টকিত হয়। সে সভ্যতা-সমাজ, রাজনীতি সকলের পক্ষে, থাকেও দুর্বলের বিরুদ্ধাচারণ করে সেই সমাজ সভ্যতা ও রাজনীতির ব্যঙ্গচিত্র কমলাকান্তের জোবানবন্দীতে অভিব্যক্ত। সাক্ষী কমলাকান্ত, ফরিয়াদী প্রসন্ন গোয়ালিনী, ও ডিপুটি হাকিম এবং উকীলদের কথোপকথন ব্যঙ্গ চিত্রে উন্মোচিত হয়েছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম" চক্রবর্তী মহাশয় ! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন ? "কমলাকান্ত বলিল, পূর্ব্বকালের মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, যেই তাহার যথার্থ অধিকারী অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপে International Law. যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গোশব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ ইনি তস্কর ভোগ্যা। সে কন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right নয় ? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে ! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

(বঙ্কিমরচনাবলী, ১৩৬১, পৃ ঃ ১০৭)

কমলাকান্তে হাসির সঙ্গে করুণরসের উৎকট বিষয়ের সততা, তরলতার সঙ্গে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা,মাতলামির সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সঙ্গে বাস্তববাদিতার, শ্লেষের সঙ্গে মানব প্রীতির সমন্বয় ঘটেছে কমলাকান্তের চরিত্রে কবি, দার্শনিক সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ ও স্বদেশ প্রেমিক প্রভৃতি সত্তার, সংস্কারহীন গোঁড়ামি শূন্য আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

De Quineey's comfessions of an opium Eator এবং 'কমলাকান্তের জোবানবন্দীর' সঙ্গে 'pickuick papers' সাদৃশ্য থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন উপনিবেশিক শাসন শৃংখলার সমাজ রাজনীতি সংস্কৃতি ও মানবজীবনের অন্তরগূঢ় তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। আপাত দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ রসিকতার বিষয় লঘু মনে হলেও এর অন্তর্নিহিতে রয়েছে গভীরতর অভিব্যঞ্জনা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঙ্গাত্মক আখ্যান রূপে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পরিচিত। এর পূর্বে ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস,' 'নববিবিবিলাস' ও 'কলকাতা কমলালয়'-সমাজ ব্যঙ্গ নক্শা আকারে বিবৃত হয়েছে। এ সব রচনার কোন কোন চরিত্র পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের-'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' রচনায় সমাজের ব্যঙ্গ চিত্র অংকনের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের- 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত'- গ্রন্থে পরিপূর্ণ গল্পের ধারা অক্ষুন্ন থাকলেও রচনাটি মূলত অর্ধেক নক্শা ও অর্ধেক গল্প জাতীয়। সমাজ ব্যঙ্গ সরাসরি লক্ষ্য হওয়ায় নকশা ও গল্পের মিশ্রণ ঘটেছে। এটিকে গল্পধর্মী রচনা বলা যায় যদিও কেন্দ্রীয় চরিত্র মুচিরামের জন্ম বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা পারিবারিক অবস্হার বিবরণ অর্থনৈতিক ক্রমউন্নয়নের তত্ত্ব এ রচনায় রূপায়িত হয়েছে। এমনকি চরিত্র পাত্রের পারস্পরিক মানসিক সম্পর্ক আভাসে ইঙ্গিতে উন্মোচিত হয়েছে। তবুও এ রচনাকে উপন্যাস কিংবা ছোট গল্প রূপে অভিহিত করা যাবে না। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' মত পূর্ণাঙ্গ কৌতুক কাহিনী ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ এটি নয়। এ রচনাটি মূলত কৌতুক রসাত্মক। এ-রচনার কারণ অশিক্ষিত, অযোগ্য ডেপুটিদের মূর্খতা, লোকতা ও নির্লজ্জ তোষামোদ ও নির্বিকার পদলেহনের দ্বারা উচ্চতম সম্মান ও পদমর্যাদায় ভূষিত হওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার জন্য।

''রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্য বলে অনুচিত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপযুক্ত রূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত অবস্হায় মুচিরামের সৃষ্টি কেন এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। তিনি নিজ সার্ব্বিসে এবং হয়ত নিজ স্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে

Dhaka University Institutional Repository

পতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা নিন্দাই ও উপহাসযোগ্য বঙ্কিম তাহারই নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন মুচিরাম-ঘটিরাম ইত্যাদির সৃষ্টি এক হিসাবে প্রকৃষ্ট সমাজ সেবা।'

(চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৪ মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, পৃ ঃ ১৮)

'মুচিরাম গুড়ের' জীবন চরিতে'র মৌল আখ্যান "মুচিরাম গুড়"কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও গ্রন্থে রয়েছে কিছু উপ-আখ্যান। এগুলো যথাক্রমে যাত্রা দলের বাস্তবচিত্র, ঈশানবাবুর আখ্যান ; ইংরেজ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিমের চরিত্র সংশ্লিষ্ট ঘটনা, বিচারালয় ও তার সঙ্গে সংযুক্ত আমলা, নায়েব, ডেপুটি সম্প্রদায়ের পরিচয় , কলকাতার ফূর্তিবাজ বাবু শ্রেণীর সঙ্গে ধান্দাবাজ ও উচ্চ অভিজাত সমাজের বিবরণ এবং শোষক জমিদার, ভক্ত পূজা, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, ও দুর্ভিক্ষ কালে সরকারী বিধি প্রভৃতি মূল আখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই গ্রন্থে মুচিরাম গুড়ের সুনির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ ও তার ক্রমবিকাশ ব্যঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এ কারণে সামাজিক অবস্থার বিবরণ, সমাজের অসঙ্গতি ও প্রদত্ত বিবরণের সহায়ক চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নক্শা সৃষ্টি করেছে। "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত"- চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

মুচিরাম দরিদ্র কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ সফলরাম গুড়ের সন্তান। তার পিতা মোনাপাড়ার গ্রামে সাজনক্রিয়ার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। বাল্যকালে তার পিতার মৃত্যুর পর যাত্রাদলের হারান অধিকারীর প্রচেষ্টায় মুচিরাম কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয় । এর অন্যতম কারণ তার মোটাবুদ্ধি । যাত্রাদল বিচ্ছিন্ন মুচিরাম অতপর ফৌজদারী অফিসের হেড কর্মচারী ঈশানবাবুর গৃহে আশ্রয় পায়। মুচিরামের সুকণ্ঠ ও সুন্দর হস্তাক্ষর ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য সহায়ক হয়। কিন্তু পাঁচ সাত বৎসরের স্কুলজীবনে মুচিরাম

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত জ্ঞানার্জনে ব্যর্থ হয়। ঈশানবাবু তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে দশ টাকা বেতনের মুহুরিগিরিতে নিযুক্ত করান। এই কাজে অবাধে অসদুপায় অবলম্বন ও ঘুষ খেয়ে মুচিরামের দুর্জয় লোভ আরও তীব্রতর হয়ে উঠে। সৌভাগ্যক্রমে গঙ্গারাম সাহেবের অনুগ্রহে মুচিরাম মুন্সীগিরিতে বহাল হন। দুই তিন বৎসর পর মুচিরাম হোম সাহেবকে তোষামোদি করে কালেক্টরী, পেস্কারী পদ লাভ করেন। অপটু মূর্খ মুচিরাম মুহুরি ভজ গোবিন্দের সহায়তায় কর্মজীবনে ক্রমান্বয়ে বিচক্ষণ রীড সাহেব মুচিরামকে ঘুষ খাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য গবর্ণমেন্টের কাছে তাকে ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করার জন্য রিপোর্ট পেশ করে। সরকারী দপ্তর যথা নিয়মে ডেপুটি কালেক্টর পদে মুচিরামকে প্রতিষ্ঠিত করায়। অতপর বাবু মুচিরাম রায় বাহাদুর মুচিরাম আখ্যায়িত হয়। পরবর্তী সময়ে মুচিরাম চট্টগ্রামে বদলীর নির্দেশ আসার পর চাকুরী থেকে ইস্তেফা পাঠায়।

মুচিরামের চাকুরী জীবনে অঢেল উপার্জন থেকে ক্রয় করা জমিদারীর আয় মুচিরামকে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করায় ও সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায় সে কলকাতায় বাড়ি কেনে, স্ত্রীসহ বসবাস শুরু করে। কলকাতা শহরের একজন নব্যবাবু হিসেবে পরিচিত হয়। তার প্রতিবেশী রামচন্দ্রে বাবু মুচিরামের সর্বনাশ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। নম্র, নিরীহ রামচন্দ্র বাঙ্গাল কৌহিলের শূন্য পদে আসন গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে বড় বাবু মুচিরামের অর্থ নিঃশেষ হয়ে আসে। চন্দনপুরে তালুকে মুচিরাম জমিদার হিসেবে প্রজাদের উপর দান সংগ্রহ করতে গেলে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষের সময় ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর মীনওয়েল সাহেব অত্র এলাকা পরিদর্শনে এসে বাংলা ভাষার অজ্ঞতায় ও চাষার সাহেবের কথা বুঝবার অক্ষমতায় মুচিরাম সৌভাগ্যের দ্বার প্রান্তে উপণীত হয়। মুচিরাম দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সহায়তা করেছে এ রিপোর্ট ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে উপস্থাপিত হলে মুচিরাম রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়। অথচ মুচিরামের দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রদানের কোন প্রকার উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অজ্ঞতায় দেশীয় মানুষের নির্বুদ্ধিতায় মুচিরামের জীবনে নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে উত্তরণের সৌধ। 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'-গ্রন্থে মুচিরামই ব্যঙ্গের প্রধান উৎস। মুচিরাম গুড়ের জীবন বিবৃতিতে লেখক যে সব কাহিনী ও ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, সেই বিবরণে কৌতুককর বর্ণনায় ব্যঙ্গভঙ্গি লক্ষণীয়। ব্যঙ্গ করার তীক্ষ্ণতা, ভাষার ক্ষমতা বিচিত্র চরিত্রের টাইপ আবিষ্কার ও কৌতুককর পরিস্থিতি নির্মাণের নিদর্শন এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষত মুচিরামের মূর্খতা ও তোষামোদি স্বভাবের বদৌলতে তার বিচিত্র জীবন ও কর্মকাণ্ড ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে। যাত্রাদলে যোগদানের পর বুদ্ধির তীক্ষ্ণ পরিশীলিত অবস্থা না থাকায় যাত্রাদলের হারান অধিকারী তাকে সামান্য কয়েকটি টাকা ঠকিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরামের যাত্রা জীবনকে পরিহাস করে এঁকেছেন।

"মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইতে কেবল "আ-বা-আ-বা-ধবলী'টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে পিছনে হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে, "মানময়ি রাধে। একবার বদনে তুলে কথা কও" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতক দূর বলিল, মানময়ি রাধে একবার বদন তুলে-" সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল, "গুড়র খাও-" শুনিয়া মুচিরাম বলিল " রাধে-একবার বদন তুলে গুড়ক খাও"। হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।"

(মুচিরাম গুড়ের জীবন রচিত, তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃঃ ১১৫)

সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশদের জেলা অফিসের বাঙালীদের বেতন নিয়েও ব্যঙ্গ করেছেন। ঈশানবাবুর প্রসঙ্গ বর্ণনায় বাঙলাদেশে বেতনের ওজনে মনুষ্যত্ব নির্ণীত হয়। কে কত বড় বাঁদর লেজ মেপে ঠিক করতে হয়। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমের লেখণীতে বানর শ্রেণীর মানুষের ব্যঙ্গ চিত্র রূপায়িত হয়েছে। প্রধানত আদালতে মোকদ্দমার দৃশ্যও ব্রিটিশ সাহেবদের চরিত্র অনুযায়ী এবং সার্বপরি মুচিরামের আচরণ চিত্রণে সংযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"সাহেব হুকুম দিলেন পুলিশের নামে পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল- তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন ম্যাজিস্ট্রেটরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না - এক কোণে বসিয়া এক একজন মুহুরি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত । সাক্ষীরা এক রকম বলিত, মুচিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী লিখিতেন মোকাদ্দমা বুঝিয়া ফি সাক্ষ্য-প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এই রূপে নানা প্রকার ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন-তিনি একা নহেন, সকলেই করিত-তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ- কখন কখন লোকের টেক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১১৮)

হাকিম ও বিচারক ইংরেজদের কয়েকটি টাইপ চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছেন। গঙ্গারাম সাহেবের মুচিরামকে তার অফিসে নির্ভরযোগ্য, উপযুক্ত লোক হিসেবে মনে হয়েছে। ইংরেজ সাহেব তাবেদারদের উপর বিশ্বাসী ছিলেন এমন কি অতিভদ্রলোক দয়ার সাগর ও সরল হওয়ায় জনৈক সাহেব মোকদ্দমা করতে গিয়ে কেবল ডিসমিস করতেন তার বাস্তব চিত্র নিম্নরূপঃ

"এই নূতন সাহেবটির নাম লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত গঙ্গারহাম-বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব অতি ভদ্রলোক, দয়ার সাগর, কাহারও কোন অনিষ্ট করিতেন না, মোকাদ্দমা করিতে গিয়া কেবল ডিসমিস করিতেন, তবে সাহেব কিছু আসল, কাজ কর্ম্মে বড় মন দিতেন না, এবং নিজে সরল বলিয়া তাঁবেদারদিগের উপর বড় বিশ্বাস ছিল। সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড

Dhaka University Institutional Repository

কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই- হেড কেরাণী সব করিত।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ ঃ ১১৮)

গঙ্গারাম সাহেবের মত হোম সাহেবকেও মুচিরাম তোষামদ করে পেস্কারি পদ লাভ করে। অন্যদিকে মুচিরামের ডেপুটি কালেক্টর হওয়ার পশ্চাতে রীড সাহেবের অবদান যথেষ্ট। রীড সাহেব প্রথমে মুচিরামকে একটি বৃক্ষভ্রষ্ট বানর অকর্মা অথচ প্রচণ্ড রকমের দুষ্কর হিসেবে জানতে পারলে মুচিরাম চোখের জলের মাধ্যমে দয়ালু চিত্ত রীড সাহেবকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত না করার ব্যাপারে নিরস্ত করে। পরবর্তী সময়ে রীড সাহেব যে যুক্তিতে মুচিরামকে ডেপুটি কালেক্টরে উত্তীর্ণ করা তার কারণ বঙ্কিমী দৃষ্টিতে নিম্নরূপ ঃ

"রীড সাহেব ইহাতে বিজ্ঞ লোকের মতই কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে ভারি ঘুষখেয়েও ডিপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে ঃ ডিপুটিগিরি এক প্রকারে আমাদিগের বৈদিক-বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মুচিরাম যে মূর্খ তাহাতে কি আসিয়া যায় নাঃ যেরূপ অনেক ডিপুটি আছেঃ ডিপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব রীড সাহেব লোকহিতার্থ মুচিরামকে ডিপুটি-করবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন ।" (অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ ঃ ১২১)

মুচিরাম চাকুরী ত্যাগের পর কলকাতায় উপস্থিত হয় । কলকাতায় মুচিরাম নব্য ধনিক শ্রেণীর ফূর্তিবাজ বাবু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুচিরামের গলিতে যে প্রথম শ্রেণীর বাটপার রামচন্দ্র দত্ত বাস করত, তার দৃষ্টিতে গ্রাম গর্দ্দভ মুচিরাম টাকার বোঝা নিয়ে কলকাতায় নাগরিক জীবন উপভোগ করতে এসেছে রামচন্দ্র গ্রাম্য বানরকে শহরের বানরে পরিণত করে তোলে। মুচিরাম কি ধরনের বানর তার প্রমাণ দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ভজগোবিন্দকে লেখা পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না-মাপ করিও। দুইখানা গাড়ি কিনিয়াছি একখানা বেরুষ-একখানা ব্রৌনবেরি। একটা আরবের মুড়িতে ২২০০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে আয়নাতে কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ তাহা জানিলে কখন আসিতাম না সেখানে সাত সিকায় ও মজুরি সমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত এখানে একটা চাপকানে ৮৫ টাকা পড়িয়াছে। এক সেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে থাল, বাটি গেলাস যে বাসনের লিতেছি না এ সেট টেবিলের জন্য বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্বাদ করিবে।" (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১২৪)

রামচন্দ্রের ধান্ধাবাজি চরিত্রের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর মুচিরামকে কপর্দক শূন্য করতে তার অনেক গুলো তালুক বন্ধকে অর্ধেক হিসেবে গ্রহণ করে । বাড়াবাড়িতে মুচিরামের আর্থিক দীনতার মুহূর্তে ভজগোবিন্দের পরামর্শে মুচিরাম চন্দনপুর তালুতে উপনীত হয় প্রজাদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশায়। মুচিরাম দর্শনে যেসব প্রজারা দূরবর্তী এলাকা থেকে আসত তারা কেউ কেউ রান্না করে খাওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর মীনওয়েল্ সাহেব গ্রামদেশের দুর্ভিক্ষ তদারকে বের হয়ে এই দৃশ্য দেখতে পান। সাহেব ঘোড়া থামিয়ে এক নিরক্ষর চাষাকে গ্রামের দুর্ভিক্ষের অবস্থা জানার জন্য প্রশ্ন করে। বঙ্কিমচন্দ্র চাষা ও সাহেবের কথোকপথনে ব্যঙ্গের শর নিক্ষেপ করেছেন।

"চাষা অবশ্য ইংরেজী জানে না। সাহেব উত্তম বাঙ্গালা জানেন, পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন; সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "টোমাডিগের গড়ামে ডুড়বেক্কা কেমন আছে?" চাষাত জানে না ডুড়বেক্কা কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পড়িল। ডুড়বেক্কা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম হইবে, ইহা এক প্রকার স্থির হইল। কিন্তু 'কেমন আছে ?' ইহার উত্তর কি দিবে ? যদি বলে সে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা

Dhaka University Institutional Repository

হইলে সাহেব হয়ত এক ঘা চাবুক দিবে। যদি বলে যে ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয়ত ডুড়বেক্কাকে ডাকিয়া আনিত বলিবে; তাহা হইলে কি করিবে? চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, বেমার আছে।

বেমার- Sick ? " সাহেব ভাবিতে লাগিলেন " Well thou may be much sickness without there being any scercity the fellow does not understand perinaps; these people are so dull-I say ডুড়বেক্কা কেমন আছে- অধিক আছে কিনা অল্প আছে ? "

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম। (সে দেশে নীলকরনাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে ডুড়বেক্কা অধিক আছে না অল্প তখন ডুড়বেক্কা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল, কই আমরা ত ডুড়বেক্কার টেক্স দিই না ; কিন্তু যদি বলি, আমাদের গ্রামে যে টেক্স নাই-তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাদের গড়ামে ডুড়বেক্কা অধিক কি অল্প আছে ? "চাষা উত্তর করিল, "হুজুর আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুড়বেক্কা আছে"। (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, পৃ ঃ ১২৬)

মীনওয়েল্ সাহেবের বাঙলা ভাষার অজ্ঞতা ও চাষার সাহেবের কথা বুঝবার অক্ষমতা মুচিরামের রাজা রাই বাহাদুর উপাধী প্রাপ্তির প্রধান কারণ। অধিকাংশ ইংরেজ সাহেব এদেশীয় অবস্হা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, রাজ্যশাসন সম্পর্কে উদাসীন এবং অতিরিক্ত জাত্যাভিমানের কারণে অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর, মানুষ থেকে তারা দূরবর্তী। এ কারণে মুচিরামের মত মূর্খ বানরকে যে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে তাদের সম্পর্কে বঙ্কিমের ব্যঙ্গচিত্র উচ্চকীত।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মুচিরাম গুড়ের কাহিনী বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সময়ে ইংরেজ রাজ কর্মচারীদের ব্যঙ্গচিত্র অঙকন করেছেন। ''মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'' ব্যঙ্গ রসাত্মক গ্রন্থ হিসেবে লেখকের পূর্ণাঙ্গ শিল্প সমৃদ্ধির স্মারক।

'কমলাকান্তের 'ভাষা' 'লোকরহস্যের' চেয়েও ছন্দময় ও কৌতুকপূর্ণ । মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে ভাষারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে সহজ আঙ্গিকটি ব্যবহার করেছেন তার সূচনা 'কমলাকান্ত' থেকে। গতিশীল বেগবান ভাষার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ

''দেখিলাম অকস্মাৎকালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে- আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম অনন্ত অকূল, অন্ধকার, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সংকুল সেই স্রোত-মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে-আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা-একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল-নিতান্ত একা মাতৃহীনা-মা ! মা ! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল সমুদ্রেমাতৃ সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা । কই আমার মা ? কোথায় কমলাকান্ত প্রসূতি বঙ্গভূমি ! এ ঘোর কাল সমুদ্রে কোথায় তুমি ? '' (বঙ্কিমরচনাবলী, পৃ ঃ ৭৯-৮০)

ব্যঙ্গ রচনার ভাষায় যে ধরনের প্রবণতা বা দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রত্যাশা করি তা বঙ্কিমচন্দ্রের আয়ত্বে ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্ত্বকথাগুলো বঙ্কিমচন্দ্র জীব জন্তু ও মানবেতর প্রাণীর কথোপকথনে এবং উদ্ভিদ, ফুল, ফল, কৌতুককর ঘটনার কেন্দ্রে সংস্থাপন করেছেন। এমনকি ঢেঁকির মত বাঙালীর গ্রামীণ সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ধান ভানার অত্যাবশ্যকীয় বস্তুটিও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ দৃষ্টির অবদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের ধারায় অন্যতম ব্যঙ্গ রচনা। গ্রন্থটির নামকরণ থেকে এ প্রত্যয় জন্ম নেয়া স্বাভাবিক যে গ্রন্থকার তাঁর সমকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ সমূহ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শরে বিদ্ধ করার জন্য অবলম্বন করেছেন নতুন সাহিত্যিক মাধ্যম 'নক্‌শা'। প্রসঙ্গক্রমে রচয়িতার স্বীকারোক্তি স্মরণীয়-

"এই নক্‌শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই- সত্য বটে অনেক নক্‌শা খানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এইমাত্র বলতে পারি যে আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, ভূমিকা)

অর্থাৎ সামাজিক মানুষ হিসেবে লেখক সমকালের নানাবিধ অসঙ্গতি দ্বারা আন্দোলিত হয়েছেন এবং সৃষ্টি করেছেন সামাজিক বহির্বাসের অন্তরালে সতত প্রবাহমান শিল্প চেতনা যাকে অভিহিত করা হয় নক্‌শা হিসেবে। ব্যঙ্গ কৌতুক সমন্বিত দেশাচার সংশোধনের জন্য প্রণীত বস্তুনিষ্ঠ রচনাকে নক্‌শা রূপে গ্রহণ করা যায়। নক্‌শাকে সুশীল কুমার দে বলেছেন'।

"Satirical Sketches of contemporary manners." সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে নক্‌শা হিসেবে অভিহিত করা হলেও এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়ঃ-

১। যুগসন্ধিক্ষণে নক্‌শার সৃষ্টি।
২। ব্যঙ্গ বা হাস্য কৌতুক নক্‌শার অন্যতম উপকরণ।
৩। নক্‌শা রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমাজ চিত্রণ।
৪। নব বিকাশমান মাধ্যবিত্তের মানস প্রতিবিম্ব নক্‌শা।
৫। নক্‌শা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও স্থূল রুচির সমাজ মানসের প্রত্যক্ষ প্রতিভাষণ।
৬। জীবন ও আচরণের বিশ্বস্ত দলিল।
৭। আখ্যান উপাখ্যান ও বাস্তব চরিত্রের সম্মিলনে সৃষ্টি।
৮। "সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি ও অনাচার নক্‌শার রাজ্যে সক্লেদে আশ্রিত ও আক্রান্ত।" (চৌধুরী, ১৯৮২ পৃঃ ১৪)
৯। নক্‌শায় সমস্ত স্তরের মানুষের ছবি রূপায়িত হয়।
১০। সমাজ-সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে নক্‌শার মূল্য অপরিসীম।
১১। নক্‌শা 'Subliterary reportage' হলেও এর রয়েছে স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য।
১২। সমাজের নঞর্থক দিক সমূহ শিল্পীর অনুভূতিতে আশ্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় নক্‌শা।
১৩। কালীক ইতিহাস পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নক্‌শার মূল্য অপরিমেয়।
১৪। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস বিধৃত হয় নক্‌শায়।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত নক্‌শা অসঙ্গত, ক্লেদাক্ত, বিশৃঙ্খল মানব সমাজ জীবন ও আচরণের উদ্ভাস হিসেবে পরিগণিত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নক্‌শার সাহিত্য মুখী অভিযাত্রা বাঙালা গদ্যে অভিনব সংযোজন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নবউদ্ভূত নাগরিক জীবনের পারস্পরিক বিপরীতমুখী স্রোতের আবর্তে সৃষ্ট নক্‌শার উপজীব্য বিষয় ছিল হঠাৎ উদ্ভূত বাবু সম্প্রদায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"কে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বৃহদায়তনের নক্‌শা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর কাহিনীগত বৈশিষ্ট্যাবলী ও কাহিনী অন্তর্ভুক্ত উপজীব্য বিষয় সমূহ নিম্নরূপ ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার সামাজিক প্রসঙ্গ সমূহ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"য় রূপায়িত করেছেন। তিনি মুখ্যত নববিকাশমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং আকস্মিক অর্থশালী হয়ে উঠা বাবুদের ব্যঙ্গ বাণে জর্জরিত করেছেন। তবে কেবল মাত্র হঠাৎ উদ্ভূত বাবু সম্প্রদায়ের আচার আচরণই নয়, তার পাশাপাশি তিনি সামাজিক ব্যাধিসমূহ ব্যঙ্গবাণে উন্মোচন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য -

১। "কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা" অংশে শহরের আতির মাতালদের মাতলামি, তৎকালীন "ইয়ংবেঙ্গালী"দের আচরণ পরিবার ও স্ত্রীলোকদের অবস্থান, বিবাহ ও বিবাহ প্রসঙ্গে গুরুপ্রসাদীর আচরণ,

২। "রমা প্রসাদ রায়" অংশে কলকাতার ব্রাহ্মণ ভোজন,

৩। "বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার" অংশে , হঠাৎ ধনীদের "বেশ্যাবাজি" প্রভৃতি প্রসঙ্গ লেখকের লেখনিতে ধৃত হয়ে সামাজিক সত্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। সামন্ত সমাজের অবসান লগ্নে ও নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্বে যে সব সামাজিক ব্যাধি ঊনবিংশ শতাব্দীর নগর জীবনকে আক্রান্ত করেছিল সে সব পঙ্কলিপ্ত সমাজের প্রকৃত ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়"। অর্থাৎ লেখক যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন তা ছিল কলুষিত, দুর্নীতি বিলাসী ও দুক্রিয়াসক্ত।

"সেই সমাজের অধিকৃত রূপ দেখাইতে যাইয়া তাঁহাকেও সেই সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য হইতে হইয়াছিল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া তিনি নির্মল স্থান হইতে উহার দিকে অবলোকন করেন নাই, সমাজের পঙ্কস্তরে নামিয়া পঙ্কলিপ্ত সমাজকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন"।

(ঘোষ, ১৩৬৭, পৃঃ ২৯৪)

বারোইয়ারি নামে সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি ও দুর্নীতি লেখক বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁ বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হওয়ার ফলে তাঁর ম্যানেজার কানাই ধন দত্ত উক্ত অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পান। এই উপলক্ষে বারোইয়ারির চাঁদা সংগ্রহ, উৎসব উদ্যোগ গ্রহণ, ইংরেজদের কতিপয় আচার আচরণ বারোইয়ারি তলায় অনুষ্ঠিত হাফ-আখড়াই তদুপলক্ষে মাতলামি, দুর্নীতি ও নোংরামির সমকালচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

(ক) "একবার শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এ বনেদী বড়মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাড়ির মেজো বাবু পাঁচোইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেচেন , সামনে মালিনী ও বিদ্যে 'দমন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ

Dhaka University Institutional Repository

ঐ বিদেশী' গান করে মুটোমুটো প্যালা পাচ্চে বছর ষোলো বয়সের দুটো (স্টকব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যাম নাচ্চে। মজলিসে রুপোর গ্ল্যাসে ব্রান্ডি চলচে- বাড়ির টিকটিকি ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভোঁ! ক্রমে মিলনের যন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রানীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর মন্ত্রণার পালা এসে পড়লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে- মালিনী বাবুদের দোহাই' দিয়ে কেঁদে বাড়ি সরগরম করে তুললে- বানুর চটকা ভেঙ্গে গেল ; দেখলেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড়ো রাগত হলেন 'কোন বেটার সাধ্যি আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়' এই বলে সামনের রুপোর গেলাসটি কোটালের রগ তেগে ছুঁড়ে মাল্লেন- গেলাসটি কোটালের রগে লাগাবামাত্র কোটাল 'বাপ' বলে অমনি ঘুরে পড়লো, চারদিক থেকে লোকেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল- খুব্দে জলের ছিটে মারা হল ও অন্য অন্য নানা তদ্‌বির হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না- কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন"।

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ৬২-৬৩)

(খ) "কল্‌কেতা শহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলমি দেখা যায়; সকলগুলি সৃষ্টি ছাড়া ও অদ্ভুত ! চোর বাগানে দনুকর্ণ মিত্তির বাবুর বাপ, ম্যাট ড্রাইব মনকিসন কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছদ্দী ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন !" (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ৬৫)"

(গ) "একবার একদল বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ শহরের মিষ্টি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিঙ্গিবাবু সে সময় অফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচজনে তাকে ঘিরে ধরে 'ধরেছি' বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গেল। সিঙ্গিবাবু অবাক- ব্যাপারখানা কি? তখন এঁজন অধ্যক্ষ বললেন, 'মহাশয়' । আমাদের অমুক জায়গার বারোইয়ারি পূজায় মা ভগবতী সিঙ্গির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আসছিলেন, পথে সিঙ্গির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আসতে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েচেন যে, যদি আর কোনো সিঙ্গির জোগাড় কত্তে পারো, তা হলে আমি যেতে পারি কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথাও আর সিঙ্গির দেখা পেলাম না ; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোনো মতে ছেড়ে দেবো না- চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্‌বির করবেন'। সিঙ্গিবাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তষ্ঠ হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্যে কল্লেন"।

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ৪৯)

বারোইয়ারি চাঁদা সংগ্রহের নানা ঘটনা উল্লেখ করে কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎকালীন সমাজের তোষামোদ প্রবণতা এবং দুর্নীতির বিচিত্র পন্থা উপস্থাপন করেছেন। এসব ঘটনার অন্তরালে লেখকের ব্যঙ্গ প্রবণ মনের সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। তিনি সমকাল সচেতনতায় সমাজের ভাঙ্গন ও নতুন সমাজ সৃষ্টির ইতিবৃত্ত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এজন্য প্রাচীন সামন্ত সমাজ ও তার বংশ গৌরবের স্থলে টাকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এবং নানাবিধ অসঙ্গতির প্রাদুর্ভাব লেখকের উপাখ্যানে বিধৃত হয়েছে। তিনি যেমন ফটোগ্রাফিক উপস্থাপনায় ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ বরেছেন তেমনি সেই বিবরণ তাঁর দৃষ্টিতে কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন কলকাতা শহরে ধনগর্বে স্ফিত হঠাৎ বাবুদের সৃষ্টিছাড়া ও অদ্ভুত মাতলামির আচার আচরণ হুতোমি দৃষ্টিতে বিধৃত হয়েছে। বিবিধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইংরেজ সাহেবদের অনুকরণে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর পুঁজিপতিদের মদ্যপান একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাধি হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দেয়। এই ব্যাধিতে শহুরে বড় মানুষ থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র এমনকি কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছদীর অধীনে ক্ষুদ্র চাকুরীজীবী পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে "কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা" অংশে দনুবাবুর 'ইস্কুল ফ্রেন্ডসহ' 'সমর ভেকেশনে'র সন্ধ্যায় মদ পানের ঘটনাটি স্মরণীয়। দনুবাবু কলেজের প্যারীবাবু ও অন্যান্য বন্ধুসহ মদ পানের এক পর্যায়ে প্যারীবাবু কর্তৃক আনিত ব্রান্ডি ও শেরি শেষ হয়ে গেলে মদ্যপদের চিৎকার হৈ চৈ এ ধর্মপরায়ণ দনুবাবুর পিতা গালি-গালাজ করলে দনুর একজন ফ্রেন্ড দনুসহ কর্তাকে 'ইয়ংবেঙ্গালী' ঘুষি মারেণ। এরপর অন্যান্যরা পুলিশের ভয়ে অন্তর্ধান করলে মাতাল দনু তার মার কাছে গিয়ে বলেছিলঃ

"মা বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক! তোমার ভয় কি! ও গুল্ডফুল মরে যাক না কেন, ওকে আমরা চাইনি; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে হেলথ (ড্রিঙ্ক) করবো, ও গুল্ডফুল মরে যাক, আমি কোয়াইট রিফর্মড বাবা চাই"। (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ৬৭)।

সামাজিক অবস্থানে তৎকালীন নারীজাতির স্থান দনুবাবুর মার মতনই নাজুক ছিল। লেখকের মতে বাঙালী সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য এই দৃষ্টান্ত বিরল। বেতাল পুরের রামেশ্বর চক্রবর্তীর একমাত্র কন্যার বাল্য বিবাহ হয়েছিল শহরের ব্রকভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে। হরহরি কলেজ পাশের পর শ্বশুরালয়ে গমন করে। কিন্তু সে সময় সেখানে নতুন বিবাহ হলে বৈষ্ণবতন্ত্রে গুরুপ্রসাদী প্রথা সম্পন্ন ব্যতীত স্বামী স্ত্রীর মিলন সম্ভাবপর ছিল না। হরহরি গুরুপ্রসাদী প্রথা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ কারণে উক্ত প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যে বাসর ঘরের খাটের নীচে লুকিয়ে থেকে গোস্বামীকে আহত করে। হুতোমীর লেখনী ধৃত কিছু অংশ এখানে স্মরণীয় ঃ

"প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'বলো আমি রাধা তুমি শ্যাম'; কন্যাটিও অনুমতি মতো 'আমি রাধা তুমি শ্যাম' তিনবার বলেচে, এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকিতে পাল্লেন না, খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে এই 'কাঁদে বাড়ি বলরাম' বলে গোস্বামীকে রুলসই কত্তে লাগলেন; ঘরের বাইরে ন্যাড়া বোষ্টুমার খোল খত্তাল নিয়ে ছিল-প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুলসইয়ের চিৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগলো, মেয়েরা উলু দিতে লাগলো, কাঁসর ঘন্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থুল পড়ে গেল। হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বললেন। দারোগা ভদ্দর লোক ছিলেন (অতিকম পাওয়া যায়), তাঁরে অভয় দিয়ে সেদিন যথাসমাদরে বাসায় রেখে তার পর দিন বরকান্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক লেগে গেল। 'যা, ইনি কেমন করে ঘরে ছিলেন!' শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে অজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে; সেই অবধি গুরুপ্রসাদী উঠে গেল, লোকেরও চৈতন্য হল; প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্তমানে সে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদী চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্বাহ হয়"। (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ৭৮)

বিকৃত বর্তমানের পুঞ্জিভূত অসঙ্গতির খণ্ডচিত্র অঙ্কনে কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রগতিশীল মানসিকতার সাক্ষাৎ অনিবারিত হয়। লেখক অতীতের যা কিছু মহান যা কিছু কল্যাণকর তার গুণ কীর্ত্তনে অকুণ্ঠ। সমাজ পরিবর্তনের স্রোতে পরিবর্তিত মূল্যবোধের সঙ্গে একাত্ম হতে না পেরে সে সব অসমর্থিত মূল্য বোধের বিচিত্র দিক কৌতুক হাস্য চিত্রিত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে লেখক ছিলেন প্রগতিপন্থী ও উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী। এজন্য কলকাতার 'ব্রাহ্মণ ভোজন' অংশে ব্রাহ্মণ ভোজের কথা বলতে গিয়ে তিনি যে চিত্র অঙ্কন করেন তার ভেতর তৎকালীন সমাজের দরিদ্র ব্রাহ্মণদের অবস্থান ও তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

" ব্রাহ্মণ ভোজনে হুজুরের আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না।" (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ১০৬)

এমনকি বাঙালীদের দারিদ্র্য ব্রাহ্মণ ভোজন সূত্রে অপ্রকাশিত থাকেনি। একই সঙ্গে পূজারী বামুন ও সাধারণ অভ্যাগত বামুন ফলারের নাম শুনে নরক কিংবা জেলে পর্যন্ত যেতে দ্বিধাবোধ করেন না। শহরের জলপান সম্পর্কে তির্যক মন্তব্যের পর লেখক তথাকথিত ধর্মভিরু ভণ্ড ও কপট তপস্বীদের কিংবা মহাপুরুষদের প্রতি ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন।

"যতদিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাকবে, ততদিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই; গোঁসাইরা হাড়ী, মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই পুরুষরা গোটাকতক হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন; এঁরা এক একজন হারামজাদকি ও বজ্জাতির প্রতিমূর্তি এদিকে এমনি সজ্জাগজ্জা করে বেড়ান যে হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে-হঠাৎ দেখলে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্রলোক! বাস্তবিক, সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো!" (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ১০৯)

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা নগরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা উৎকোচ, জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি দ্বারা একশ্রেণীর লোক ধনী গৃহস্থে পরিণত হয়। এই শ্রেণীর জনগোষ্ঠী তোষামোদ পরায়ণ ও দুশ্চরিত্র হওয়ায় শহরের নৈতিক স্খলন ত্বরান্বিত হয়। প্রবল ইন্দ্রিয়াসক্তির দরুণ তাদের বাসস্থান সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অসংকোচে অনেক ভদ্র পরিবার রক্ষিতা বা উপপতি লালন পালন করত। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়-

" অন্যান্য প্রদেশের ত কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভদ্র সন্তানেরা প্রকাশ্যভাবে দূষিত চরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। এখনও কি করিতেছেন ? এখনও প্রকাশ্যে রঙ্গভূমিতে কলকতা শহরের ভদ্র পরিবারের যুবকগণ ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের অপরাপর

Dhaka University Institutional Repository

বহু ভদ্রলোক গিয়া অর্থ প্রদান করিয়া উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।"(শিবনাথ শাস্ত্রী,১৯৫৭ পৃঃ ৪৩)

ধনী গৃহস্থদের প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসীর সঙ্গে আমোদ প্রমোদ তৎকালীন সমাজে তাদের সম্ভ্রম সূচক কিংবা সামাজিক মর্যাদার বিষয় হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত উঠতি ধনী ও সম্পন্ন মধ্যত্তি ভদ্র গৃহস্তদের সন্তানরাও বারাঙ্গনাদের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করে কাল কাটাত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ- " বাবু পদ্ম লোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার" উপাখ্যানে একদা নিঃস্ব পদ্মলোচন গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে বাসার চাকর থেকে ক্রমে "ওজো সরকারী" এবং ভাগ্যগুণে "মুচ্ছুদীতে" নিযুক্ত হয়ে কলকাতা শহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন এবং হঠাৎ বাবুর উপসংহারে অগাধ টাকার মালিক রূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ হিসেবে ঘড়-বাড়ি ও অন্যান্য মূল্যবান আসবাবের সঙ্গে "বাবু স্বরং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখেন।" (হুতোম প্যাঁচার নক্শা পৃ ১২৮)

কালীপ্রসন্ন সিংহ এ প্রসঙ্গে এ ধরনের শহুরে বাবু বা মহাপুরুষদের বেশ্যাসক্তি সম্পর্কে নক্শা অঙ্কন করতে গিয়ে সামাজিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারী জাতির নিগৃহীত ও অবরুদ্ধ অবস্থার বিবরণ প্রদান করেছেন।"বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরির কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহু কাল হল ঘরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ে বাড়িগুলি আজও মনুমেন্টের মতো তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে- সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয়নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজ রাজড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আমলা দাওয়ান মুচ্ছুদীরা যেন হুজুরদের হয়ে বিষয়কর্ম দেখেন স্ত্রীর রক্ষণা বেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমতো বর্তায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন। এই ভয়ে কোনো কোনো বুদ্ধিমান স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারারাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গেলে ফরসা হবার পূর্বে গাড়ি বা পালকি করে বিবি মাহেব বিদেয় হন- বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন- স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রান সাহেব বিদেয় হন-বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ণ করেন স্ত্রী বাবি থেকে মুক্তি পান। ছোকরাগোছের কোনো কোনো বাবুরা বাপ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্রি কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়িতে এসে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন- বাড়ির কেউ টের পায় না যে বাবু ঘরে থাকেন না। (হুতোম প্যাচার নক্শা, পৃ ১২৮-২৯)

লেখকের মতে ধর্মে আসক্তি শূন্য হিতাহিত জ্ঞানহীন ও কতিপয় হতভাগ্য মোসাহেব পরিবেষ্টিত বাবু সম্প্রদায় কলকাতা শহরকে বেশ্যা শহরে পরিণত করেছে। কারণ এমন পাড়া নেই যেখানে দশ ঘর বেশ্যা নেই, সেখানে প্রতি বছর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একজন ধনী গৃহস্থের পাশে ভদ্র গৃহেস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করার উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা শহর বেশ্যাশহরে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। মূলত নবাবী আমলে মুসলিম সম্রাটদের হেরেম খানা কিংবা সম্ভ্রান্ত জমিদারদের জলসা ঘরে দৃষ্টান্তে প্রভূত ধনের অধিপতি কলকাতাবাসী স্বজাতি, সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের পরিবর্তে উৎসাহীত ছিল নীতি বহিভ'ত অপকর্ম ও আত্মমুখমগ্ন।

এজন্যই পদ্মলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে হুতোম প্যাঁচার অন্তরীক্ষ থেকে যে নক্শা নিয়েছেন তাতে প্রথাগত সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানের পার্শ্বে পদ্মলোচনের অনাচার লিপিবদ্ধ হয়েছে। অশিক্ষিত পদ্মলোচন সন্তানদের শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন না। এজন্যে আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক চিকিৎসায় ছিল তার বিরাগ। সংস্কার আচ্ছন্ন কিন্তু আধুনিক জীবন মাত্রার নগ্ন দিকগুলোর উপাসক পদ্মলোচন হঠাৎ আবতার রূপে অভিহিত। এই সব সামাজিক কীট সম্পর্কে লেখকের উক্তি স্মরণীয়-

"আলালের ঘরের দুলাল লেখক বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন, শহরের মাতাল বহুরূপী' কিন্তু আমরা বলি, শহরের বড়মানুষরা নানারূপী- এক এক বাবু এক এক তরো, আমরা চড়কের নক্শায় সেগুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণনা করেছি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণনা করা যাবে- তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্শাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পারলেন- এই মহাপরুষেরাই রিফর্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গ সুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কন্টক ও সমাজের কীট !"

(হুতোম প্যাঁচার নক্শা, পৃ ১৩৭-৩৮)

প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পক্ষে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিশেষত রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্ম ও "সমাজ সংস্কারের আন্দোলন" এবং নব প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা উন্মাদিনী শক্তি প্ররোচিত করেছিল লেখককে সর্ব প্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা বর্জন কয়ায়।

আঠারো শতকে রামহমোহন রায় কর্তৃক কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল সনাতন আচার সর্বস্ব হিন্দু সমাজের জন্য একটি বিদ্রোহ। এমনকি আঠারোশ তিরিশ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত "ব্রাহ্ম সভা" ছিল তৎকালীন সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ "ব্রাহ্ম সভা" জাতিবর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের জন্য উন্মুক্ত এবং একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ঘটে, কোন পরিমিত দেবতার পূজা হতো না। ফলে সমাজ জীবনে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজের মধ্যে যে বিরোধের ঘূর্ণি সূচিত হয়েছিল তার আন্তঃস্বরূপ কালীপ্রসন্নের অভিজ্ঞতায় মুদ্রিত ছিল। সমাজের গভীরতল স্পর্শ করে তিনি তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজ অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মদের বিচিত্র দিক উদঘাটন করেছেন।

"আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একসেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসানা করেচেন- আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগত করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোনো উপাচার্য বড়ো ধুম করে কালীপূজো করেছিলেন ও বিধাবা বিবাহ যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জামিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবরা খেতে ও ত্রুটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারের সমাজে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

চক্ষু মুদিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পারবেন না; ক্রমে ক্রিশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্ছে"।

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কলিকাতার চড়ক পার্বন, পৃ ৪০)

লেখক বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন ও ব্রাহ্ম হিসেবে "তত্ত্ববোধিনী সভায়" অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বিধবা বিবাহের জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান সমাজ-সংস্কারক ও বিদ্বজ্জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি সকল সংকীর্ণতা, ভণ্ডামী ও পরধর্ম বিদ্বেষ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-মন-সংস্কৃতি ছিল ধর্ম দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রথাগত ও আচার সর্বস্ব ধর্মীয় জীবনাচার দ্বারা মানব মন ছিল আচ্ছন্ন। এ ছাড়া তখন কৌলিণ্য ও বংশ মর্যাদার প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তৎকালীন শহরের লোকের ধর্মভাব ছিল অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসব কীর্ত্তন, দোল যাত্রার আবীর, রথ যাত্রার গোল এসব নিয়ে মানুষের মন আনন্দে মত্ত হতো। গঙ্গাস্নানে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, স্নানযাত্রা, উপবাস, প্রভৃতির দ্বারা তীব্র পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়- এই ছিল মানুষের স্থির বিশ্বাস।

এমন কি কলকাতায় বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরেজদের অধীনে বিষয়কর্ম করে ও স্বদেশবাসীর নিকট ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করতে সচেষ্ট হতো।

ব্রাহ্মণদের বিচিত্র বিরোধী আচরণের পাশাপাশি বৈষ্ণব মতাবলম্বী অবতার গোস্বামী ও পাদ্রীদের আচার আচরণ এবং নানাবিধ অসঙ্গত ধর্ম এষণা হুতোমের নক্‌শায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। "নাক কাটা বঙ্কু" অংশে লেখক সন্ন্যাসীর প্রতি সমর্পিত মানুষের হীনবুদ্ধিতার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন।

"আজ কাল যেখানে যে ধর্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সে ধর্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্তন হচ্ছে, ধর্ম, সমাজ রীতি ও নিয়মও এড়াচ্চে না। যে রাম মোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্মের শরীর নির্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটি অস্বীকার করেন- ক্রমে ক্রিশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্মের অলংকার করে তুলেচেন- আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ন। যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়-জ্ঞান থাকে তো, তাহলে সাধ করে 'ঘোড়ার ডিম' ওআকাশকুসুমে'র দলে গণ্য হতেন না! সুতরাং একদিন জমিদার বলে ডাকলেও ডাকতে পারি।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা/নাক কাটা বঙ্কু, পৃ ১২০)

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসীর মদকে দুধ বানানোর বুজরুকি ধরা পড়ার পরে অন্যান্য ধর্ম সঙ্গীত প্রবঞ্চনা তিরোহিত বা অপসৃত হয়। বৈষ্ণব গোস্বমীর মধ্যে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাবাজীদ্বয়ের যে ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে লেখকের সামাজিক মঙ্গলের প্রতি আনুগত্যই প্রদর্শিত।

"হিন্দু ধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাই গিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো একটা রোগা দুর্বল গেঁসাই দেখতে পাইনি ! গোঁসাই বললেই একটা বিকটাকার ধুম্মলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্ট আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড়ো বড়ো বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওটবার যো নাই।

এ সওয়ায় গোঁসাইরা আন্ডার টকরের (মুন্দফরাস) কাজও করে থাকেন- পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দন মড়াও ফেলেন, বেওয়ারিশ বেওয়া মনে এরাই তার উত্তারাধিকারী হয়ে বসেন"। (হুতোম প্যাঁচার নক্শা, পৃ ৭৩)

কালীপ্রসন্ন সিংহ বৈষ্ণব গোস্বামীর কিংবা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর পদ্মলোচনের উপাখ্যানে বিধৃত করেছন সংকীর্ণ, সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া এবং সর্ব প্রকার প্রগতির পরিপন্থির মানুষের মনোজগৎ।

"তিনি যেমন হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবা বিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন, ইংরেজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে ক্রিশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরেজি পড়াননি, বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্দেষ। নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানোও হয়ে ওঠে নাই বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃতে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়ার দলেই পড়ে।" (হুতোম প্যাঁচার নক্শা, পৃ ১৩৬-১৩৭)

ইংরেজ মিশনারীদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারের বদৌলতে এ দেশীয় যারা উক্ত ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হন তাদের আচার-আচরণ ও ধর্ম প্রচারকদের কর্মকাণ্ডের নানা অনুষঙ্গ লেখকের তীক্ষ দৃষ্টিতে রূপায়িত হয়েছে।

নবদীক্ষিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অনেকে পূর্ববর্তী পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি বঞ্চিত হলে কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থায় স্বীকার হন।

"কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন- কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া- সুবর্বণ চৌকিদারের মতো পোশাক পেন্টুলন, ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙকাটা টুপি। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্ঠধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন- হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুল নাচেন নকিব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ঠ কি বলেচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চেনা ! পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হত, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড়ো ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশী খ্রীষ্ঠানদের দুর্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।" (হুতোম প্যাঁচার নক্শা, পৃ ৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের প্রভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কার আচার আচরণ ও ধর্মকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। আচারনিষ্ঠ বাঙ্গালী সমাজের ভারতীয় সনাতন ধর্মের অনুষ্ঠন সমূহ যথা রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দুর্গোৎসব, রামলীলা প্রভৃতির বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বর্ণিত হয়েছে।

দুর্গোৎসব বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পার্বণ, বিশেষত এই উপলক্ষে কলকাতা শহরের যে রূপ দেখা যায় তাতে রাজপথ থেকে শুরু হয়ে পুজো বাড়ি পর্যন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস ও নানা ধরনের অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়। একই সঙ্গে এই পূজা উপলক্ষে শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের আয়োজন লেখকের ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

"এ শহরে আজকাল দু-চার এডুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পূজা- আচ্চা করে থাকেন- ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিল্‌দোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান, আলাপী ফিমেল ফ্রেন্ডরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পূজোরও কিছু রিফাইন্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ি নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রাণামীর টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, কিন্তু এদের বাড়ি প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্কে জমা হয় ; প্রতিমের সামনে বিলিতি চর্বির বাতি জ্বলে ও পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার আলাউয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজানো হয়-মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট্ পরেন, স্যান্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্তে কাতলী করা গরম জলে স্নাস করে থাকলে, শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্মকর্তার প্রাতরাশের টি ও কফি প্রস্তুত হয়"।

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ১৬১-৬২)

চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার সামনে আরতী উপলক্ষে কলকাতার বিচিত্র মানুষের সমাগম ও তাদের আচরণ লেখকের ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষত কলকাতার হঠাৎবাবু সমাজের পূজায়োজন সে সব বাবুদের আচরণ এবং তৎকালীন কলকাতা শহরের বাস্তবচিত্র লেখক বস্তুনিষ্ঠ আঁচড়ে তুলে ধরেছেন। উৎসব উপলক্ষে পুজো বাড়ির বাবু বন্ধুবান্ধব সহ কখনও বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে খ্যামটা নাচ, কখনও চটুল রসিকতায় মজলিস গরম রাখে। আবার চণ্ডীমণ্ডপে জুতোচোররা জুতো চুরিতে হাত পাকায়। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ-

"ক্রমে অনেক অনাহুত নিমন্ত্রিত জড়ো হতে লাগলেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল, জুতোচোর সেই লাঙ্গা তরোয়ালের পাহারার ভেতর থেকেও দু-ঝুড়ি জুতো সরিয়ে ফেললে। কচ্ছপ জলে থেকেই ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবর্তার মধ্যে আপনার জুতোর উপর নজর রেখেছিলেন; কিন্তু ওঠবার সময় দ্যাখেন যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মতো ফুটে সরেচেন, ভাঙ্গা ডিমের খেলার মতো হয়তো একপার্টি ছেঁড়া চটি পড়ে আছে।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ১৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গোৎসবের মতো রথযাত্রার বিবরণে লেখক জনৈক মাতালের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। রথযাত্রার চতুর্দিকে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে দর্শক হিসেবে মাতাল রথ দর্শনে বলেছে ঃ

" কে মা রথ এলি ?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চূড়োর উপর মুক পোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘন্টা নাড়া
মধ্যে বনমালী!
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,
লোকের টানে চলচে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা
বেহদ্দ ছেনালি।"
(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ১৫৬)

দুর্গোৎসব ও রথযাত্রার মতো রামলীলা "রামলীলা" অংশে বাবু সম্প্রদায়ের কলকাতা শহরের রামলীলা উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও তৎসঙ্গে মোসাহেবী আচরণ রূপায়িত হয়েছে। কলকাতা শহরে মজুর থেকে লক্ষপতি সকলেরই মনে সমান সখ। এই জন্য ঘারোয়ারী খোট্টা এবং বারবনিতার সঙ্গে ধনপতিরাও রঙ্গ তামাসায় অপব্যয় করতে যারপরণায় উৎসাহী। রামলীলার বাগান বাড়ির এবং বাগানবাড়ির বাইরের জনতার বিচিত্র অবস্থান লেখক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায়লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনকি রামলীলা পর্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বাবুদের রামলীলার স্মৃতি মন্থন এবং কোম্পানির কাগজের দালালী ও গাঁতের খাল কেনার দরুণ ধনপতি বাবুরামভদ্দের সঙ্গীত পরিবেশন এই অংশে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

'মাহেশের স্নান যাত্রা', লেখক গুরুদাসের আখ্যানের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি নক্‌শার আঁচড়ে তুলে ধরেছেন। শহরের স্নানযাত্রার বিচিত্র যাত্রীদের রাজপথ চারণ এবং গঙ্গার বর্ণালী চিত্রণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে মানুষের নৈতিক স্খলন ও রঙ্গরস কালী প্রসন্ন সিংহ ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে অঙ্কন করেছেন। একটি অংশ স্মরণীয় ঃ

"এদিকে আমাদের নায়ক গুরুদাসবাবুর বজরায় মজিদের খাওয়া দওয়া হয়েছে; দুপুরের নামাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, এমন সময়ে গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দ্যাখ ভাই গুরুদাস ! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েছে, কিন্তু একটার জন্য বড়ো ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে; সবই হয়েচে, কেবল মেয়েমানুষ না হলে তো স্নানযাত্রার আমোদ হয় না। যা বলো, যা কও,অমনি কেদার ঠিক বলেচ বাপ!' বলে কথার খিধরে নিলেন; অমনি নারাণ বলে উঠলেন, 'বাবা, যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষষি ! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি।" (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, মাহেশের স্নানযাত্রা,পৃ ১৪৩)

মূলত উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা নগরী যে পরস্পর বিরোধী পঙ্কস্রোতে ও ধর্মীয় আচার-সর্বস্বতায় পরিচালিত হয়েছিল, তারই অনুপুঙ্খ উদ্ভাস কালীপ্রসন্নের নক্‌শার তুলিতে উন্মোচিত হয়েছে। গোঁড়া ও সংকীর্ণ চেতার

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারীদের সম্পর্কে তার পূর্বাপর পরিচয় ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচায় ও কৌতুক হাস্যে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ-ছয় বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ ছিলেন অথচ তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের কৃত্রিমতাকে ব্যঙ্গ করেছেন । বৈষ্ণব গোস্বামী বৈষ্ণবদের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র অঙ্কন করে প্রমাণ করেছেন তাঁর প্রগতিবাদীতার।

পলাশী যুদ্ধোত্তর ইষ্টইণ্ডিয়ান কোম্পানি এদেশের কর্তৃত্ব পর্যায়ক্রমে কুক্ষিগত করার পর কলকাতা বাণিজ্যিক নগরে পরিণত হয়। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানির কতিপয় কর্মকর্তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সংস্কার বাংলার উৎপাদন মুখী জনজীবনের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে। বিশেষত "১৭৬৮" ও "১৭৬৯"- এর অনাবৃষ্টিজনিত শস্যহানি ১২৭৬ এর মন্বন্তরের সৃষ্টি করে। এখানে স্মরণীয় যে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজরা এই মহামারী নিবারণের প্রচেষ্টা অবলম্বন করেননি। এমনকি বিপর্যস্ত জনজীবন ইংরেজ গভর্মন্টের জমিদারদের সঙ্গে রাজস্বের নতুন বন্দোবস্তে ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য সীমার অন্তিম লগ্নে উপনীত হয়। নীলকরদের অত্যাচার এবং নব্য জমিদারতন্ত্রের রাজস্ব সংগ্রহ জন-জীবনের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ করে দেয়। শিব-নাথ শাস্ত্রীর ভাষায়-

"প্রথম প্রথম কোম্পানির কর্মচারীগণ এরূপ স্বল্প বেতন পাইতেন যে, সে রূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না। কিন্তু অবৈধ অর্থোপার্জ্জনের উপায় এত অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এ দেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কর্মচারীর অধিকাংশকে ফ্যাক্টর বা কুঠীওয়ালা বলিত। কুঠীওয়ালাগণ কোম্পানির কুঠী সকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্য হিসাবে দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, হিসাবপত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরী কার্য্যের সহায়তা করিতেন।" (শাস্ত্রী, ১৯৫৭, পৃ ৯১)

এছাড়া কলকাতা নগরের সম্প্রসারণ এবং ইংরেজ বণিকদের সাহায্যকারী হিসেবে "মুৎসুদ্দী" মহাজন শ্রেণীর বিত্তবান শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া এবং বিত্তবান জনগোষ্ঠী, দেশীয় ব্যবসায়ী, প্রাচীন ও নবীন জমিদারদের কলকাতার বসতি স্থাপন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রাচীন সামন্ত সমাজের বিলুপ্তি এক অনিবার্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নব্য সমাজ অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত করে। প্রাচীন সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন তখন শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন সমাজের কোন স্থির মূল্যবোধ তখনও জাগ্রত হয়নি। ফলে বিনাক্লেশে, নীতিহীন, গ্লানিকর প্রন্থায় অপরিমিত ধন সম্পদের মালিক হয়ে এক শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বিলাস ব্যসন ও কলুষিত জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ বড়লোক হয়ে তারা সমাজে যথেচ্ছাচারের প্লাবন প্রবাহিত করেছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই দুর্নীতি আশ্রিত দুরাচার মানুষের ধনবান হওয়ার ইতিবৃত্ত কৌতুকহাস্যে চিত্রিত করেছেন।

"হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না; 'হঠাৎ অবতার' হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হয় নাই- বাদশাই পেলেই যে সে আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন- তিনি হাই

Dhaka University Institutional Repository

তুললে হাজার তুড়ি পড়ে- তিনি হাঁচলে জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। ওরে! ওরে! হুজুর ও 'যে হুকুমের' হল্লা পড়ে গেল, ক্রমে শহরের বড়ো দলে খবর হল যে কল্‌কেতার ন্যাচ্‌র‍্যাল হিষ্ট্রির দলে একটি নম্বর বাড়লো !"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পদ্মলোচন, পৃ ১২৮)

১৬৯০ খ্রীঃ ইংরেজরা কলকাতায় স্থায়ীভাবে ব্যবসা শুরু করলে ক্রমান্বয়ে শহরের গ্রাম্যরূপ অপসৃত হয়ে শাহরিক প্রসাধন বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ সমাজ শহরে স্থানান্তরিত হলে কলকাতায় এক অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অভিজাত শ্রেণী প্রধানত দেওয়ানী, বেনিয়ানী ও ব্যবসা বাণিজ্য এবং ঠিকাদারী ও ইংরেজদের অধীনে চাকরী করে অর্থ উপার্জন করে।

"১৭৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত করা হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশের আমলে এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কোম্পানির প্রত্যাশা সিদ্ধিলাভ করে না। 'সূর্যাস্তে আইন' অনুযায়ী অনাদায়ী মহালগুলিকে নিলামে চড়ানো হয়। কলকাতার নব্য-ধনিকেরা নিলাম থেকে সে সব মহাল কিনে নিয়ে নিজেরা জমিদার হয়ে বসে। কৃষিকলাবিদ, উদ্যোগী, ও সাহিত্য সংস্কৃতি অনুরাগী জমিদারদের পরিবর্তে সৃষ্ট হয় এক প্রবাসী, আধা-সমান্ততান্ত্রিক ও রায়তদের ওপর অত্যাচারী জমিদার শ্রেণী। দেশের সামাজিক বিন্যাস এতে বিপর্যস্ত হয়। বাঙলা সামন্তরাজগণ ও জমিদারবৃন্দের প্রতাপ, প্রতিপত্তি ও গৌরবের এখানেই ছেদ ঘটে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কার্য তার এক বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা হারায়।"

(ড. অতুল সুর, ১৯৮৫, পৃ ২৫)

পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার ভেতর আবির্ভূত হয় নানা অসঙ্গতি। কলকাতা শহরের দালাল, মোসাহেব এবং হঠাৎ ধনপতি প্রভৃতি প্রভূত অর্থ উপার্জন করে পরিণত হয়েছিল বাবু সম্প্রদায়ে। কালীপ্রসন্ন সিংহ এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। "রেলওয়ে" অংশে লেখক সাধারণ দরিদ্র মানুষের রেলযাত্রার কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন। তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষগুলো কিভাবে অসৎ রেল কর্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয় তার বস্তুনিষ্ঠ চিত্রের পাশাপাশি শহরের নিম্নপেশার মানুষের অর্থনৈতিক স্তর ও জীবিকার সার্বিক পরিচয় তুলে ধরেছেন।

"এদিকে হস হস হস করে ট্রেন টারমিনাসে উপস্থিত হল, টুনুনাংন্টাং টুনুনাংন্টাং করে পুনরায় ঘন্টা বাজলো, লোকেরা হল্লা করে গাড়ি চড়তে লাগলো, থার্ড ক্লাসের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগলো, ভেতর থেকে 'আর কোথা আসচো!' 'সাহেব আর জায়গা নাই' ' আমার বুঁচকি। আমার বুঁচকিটা দাও।' 'ছেলেটি দেখো ! আ মলো মিনসে ছেলের ঘারে বসেছিস যে !' চিৎকার হতে লাগলো, কিন্তু রেলওয়ে কর্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মে অনুগত বলেই তাদৃশ চিৎকারে কর্ণপাত করেন না। এক একখানি থার্ডক্লাসে কাঁকড়ার গর্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে উঁকি মাচ্চেন-যদি নিশ্বাস ফ্যালবার স্থান থাকে, তা হলে আরও কতকগুলো যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্ল্যাক হোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে একদিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটির সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্লাকহোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড়ো কম নয়।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, রেলওয়ে পৃ ১৮৯-৯০)

উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার মতই এ সময়ে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল ব্যাধিগ্রস্ত। সাংস্কৃতিক উত্তরাধীকারে বাঙালী প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমৃদ্ধ ছিল। বিশেষত গ্রামীণ জীবনের মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক এবং বিভিন্ন পালা পার্বণে গানে অভিনয়ে কাব্যে ছিল বিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব।

৬০০ বৎসরের বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে পালা গান, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি ছিল প্রধান বিনোদনের মাধ্যম। কিন্তু পলাশী যুদ্ধোত্তর অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্রুত পরিবর্তনশীল সময় পর্বে এসব নির্ভেজাল বিনোদন উপকরণের পাশে প্রাধান্য বিস্তার করল কবিওয়ালার টপ্পা হাফ-আখড়াই ও ইংরেজ প্রভাবিত অশ্লীল যাত্রা। সামন্ত সমাজ আশ্রিত ও ললিত কবি সাহিত্যিক সঙ্গীতজ্ঞের পরিবর্তে নব্য ধনিক শ্রেণীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো নাচুনে বাইজি ও অশ্লীল কবিওযালাদের যাত্রা ও পাঁচালী। কলকাতার সমাজে অভিজাত শ্রেণীর আত্মমর্যাদার প্রধান মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াল বিভিন্ন পালাপার্বন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের; বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, গোস্বামীদের কীর্ত্তন। কালীপ্রসন্ন সিংহ পরিবর্তনশীল সমাজ পটভূমিতে হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী, যাত্রার দল প্রভৃতির উদ্ভব ও আস্বাদনকারীদের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

"নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মতো অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মতো ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। ফুল আখড়াই, পাঁচালীও যাত্রার দলেরা জন্ম গ্রহণ কল্লে। শহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন; রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এই সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই আবধি শহরের বড় মানুষরা হাফ আখ্‌ড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শ্যামবাজার, রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড়ো বড়ো নিষ্কর্মা বাবুরো এক এক হাফ আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্থগোছ হাড় হাবাতেরা মৌখিক দোহারের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ-আখড়াইয়ের পণ্যে চারটি জুটে গেল।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কলিকাতা বারোইয়ারি পূজা, পৃ ৫১-৫২)

বীরকৃষ্ণ দাঁর উদ্‌যোগে প্রথম রাত্রে বারোইয়ারি তলায় হাফ- আখড়াই এর উৎসব লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। বীরকৃষ্ণবাবু দোয়ার বৃন্দ মুখোর্স্যেদের ছোটবাবু ও অন্যান্যদের সম্মিলনে যার যার আড্ডার আয়োজন তার তুচ্ছতম বিষয় পর্যন্ত লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এমনকি গায়েনদের চড়া সুরের আমেজ ও পারিবার্শ্বিকতায় তার প্রভাব লেখক তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে রবিবারে অনুষ্ঠিত বারোইয়ারি তলায় যাত্রা ও পাঁচালীকে কেন্দ্র করে যে মাতালদের ও অন্যান্যদের সমাবেশ হয়েছে তাতে লেখক তৎকালীন সাংস্কৃতিক রুচির স্বরূপটি উন্মোচান করার প্রয়াস

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছেন। আবার রবিবারে শহরের বড় মানুষ বাবুরা আপন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদন রত হয়। এই খ্যামটা নাচের খ্যামটাওয়ালীরা "নিজ নিজ তোবরা তুবরি" সঙ্গে করে যে অশ্লীল নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে তাদের সেই বস্তুনিষ্ঠ চিত্র লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

"কোনো কোনো বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান-কোনো খানে কিস না দিলে প্যালা পায়খনা- কোথাও বলবার যো নয়। বারোইয়ারি তলায় খ্যামটা আরম্ভ হল, যাত্রার যশোদার মতো চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালী ঘুরে ঘুরে কোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে 'ফণির মাথার মণি কল্লি বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরান হারালি' গাচ্চে, খ্যামটাওয়ালীরা ক্রমে নিমন্তন্নেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে এগিয়ে অগগরদানী ভিকিরির মতো প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন ! রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যামটা বন্দ হল-খ্যামটাওয়ালীরা অধ্যক্ষমহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারি তলা পবিত্র হয়ে গেল।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা, পৃ ৭০)

আঠারো শতকের শেষার্ধে কবিওয়ালা ও টপ্পা গানের প্রচলন তৎকালীন সময় স্বভাবের অনিবার্য ফল। বিশেষত কলকাতা নগরের বিভিন্ন পালা পার্বণে আয়োজিত কবিওয়ালাদের গান ও নাচ বিনোদনের অন্যতম উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত ছিল আবার বৈষ্ণব গোস্বামীদের কীর্ত্তন ও দোহারার গান শহরবাসীদের কাছে ছিল জনপ্রিয়। লেখক কৌতুকরসে মণ্ডিত করে লিখেছেন-

"এদিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধল্লেন । ধোপাপুকুর রন্ রন্ কত্তে লাগলো- ঘুমন্ত ছেলে মার কোলে চমকে উটলো- কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো-বোধ হতে লাগলো যেন হাড়ীরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙিয়ে মারচে। গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড়ো খুশি হয়ে সাবাস, বাহবা! ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন-দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগলো, সমস্ত দিবা পরিশ্রম করে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, গাওনার বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে খোঁটা ও দাড়ি নিয়ে দৌড়ালো!"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা, পৃ ৫৫)

মূলত কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎকালীন সময়ে নবগঠিত ও নব উদ্ভূত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর অপূর্ণতার কারণে তিনি সমাজের অন্তঃসার শূন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানদিকে তীব্র ব্যঙ্গ বাণে উন্মোচিত করেছেন। হঠাৎ ধনিক শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া শহরবাসী জনগোষ্ঠীর সুসাস্কৃতিক রুচির ব্যত্যয় লক্ষ করে লেখক বিদ্রূপপরায়ণ হয়ে উঠেছেন।

মিউটিনি, নানা সাহেব , জষ্টিস ওয়েলস, পাদরী লং ও নীলদর্পণ প্রভৃতি অংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৮৫৩ সালে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তৎকালীন কলকাতা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যমনিতে পরিণত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পাদরী লং এর সংবর্ধনা তাঁর প্রগতিশীলতার দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ ' ইংরেজীতে প্রচার করার অভিযোগে নীলকরেরা পাদরী লং- এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, কারাবাস ও অর্থদণ্ড বিধান করে ছিল। সে সব অভিযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ পাদরী লং-এর পক্ষালম্বন করেন। এমনকি আদালতের অর্থদণ্ড পরিশোধ করে তিনি রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যারে স্মরণার্থে কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপনের জন্য বঙ্গবাসীদের প্রতি যে আহবান জানিয়েছিলেন তাতে তাঁর সমাজ কল্যাণের প্রতি অনুরাগ অভিব্যক্ত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগোষ্টীর জন্য অকাতরে তার সাহায্য প্রদান একটি অন্যন্য দৃষ্টান্ত।

সর্বোপরি স্বাজাত্যবোধে উজ্জীবিত কালীপ্রসন্ন সিংহ "সিপাহী বিদ্রোহ" ও তার নায়ক নানা সাহেব ও অন্যান্যদের বিরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করেননি। বরং "নীলদর্পণ" মোকদ্দমায় স্যার মর্জ্যানট ওয়েলস-এর বাঙালীদের মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হিসেবে বিহ্নিত করাকে তিনি সমগ্র জাতির অপমান রূপে অভিহিত করেছেন। বাঙালী চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপনের জন্য কালী প্রসন্ন সিংহ বিচারপতি ওয়েলসের বিরুদ্ধে ১৮৬১ সালে ২৬শে আগষ্ট তাং রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে আয়োজিত সভায় তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারণ করে বক্তৃতা প্রদান করেন।

"হুতোম প্যাঁচার নক্শা"য় লেখক এই উপলক্ষে তৎকালীন কলকাতায় ধনবান বড় মানুষদের পলায়নপর মনোবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হুলে লিপিবদ্ধ করেছেন।

"শহরের অনেক বড় মানুষ- তাঁরা যে বাঙালীর ছেলে, এটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুনোগলির আনড্রু পিদ্রুসের পৌত্তুর বললে তাঁরা বড়ো খুশি হন; সুতরাং যাতে বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বীপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দিরে ওয়েলসের বিপক্ষে বাঙালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়োই দুঃখিত হলেন খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা করতে লাগলেন ! রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিশ পড়লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত , একবার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উঁচুদরের সুপারিশ হলেও সহসা রাজি হলেন না। সুপারিশওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মতো সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চললো।" (হুতোম প্যাঁচার নক্শা, জষ্টিস ওয়েল্স, পৃ ৯৯)

নক্শার পটভূমি জটিল সমাজ জীবনের গভীরে পতিত ইংরেজ বণিকদের শাসন ক্ষমতায় সুদৃঢ় হওয়ার পর এদেশের জন জীবনের চন্দ্র নীতির দৌরাত্ম্যে কেবল মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ক্ষুণ্ন হয়নি বরং সামাজিক জীবন বিপন্ন হয়েছিল অধিকতর। ইংরেজ শাসনের রাজনৈতিক অভিঘাত ব্যাপক রূপ ধারণ করে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে। ১৮৫৭ সালে মিডটিনি ছিল লর্ড ডালহৌসির সম্প্রসারণ নীতির অনিবার্য অসন্তোষ ও তাঁর প্রতিবাদ । বারাকপুরের একদল সৈন্যকে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কর্মচ্যুত করা হয়। কর্মচুত্য সিপাহীরা দমদম কারখানায় প্রস্তুতকৃত গো ও শুকর দ্বারা নির্মিত পৃথক দুই প্রকারের টোটার সংবাদ ব্যাপক ভাবে প্রচার করলে চারিদিকে অসন্তোষের অগ্নি ব্যাপ্ত হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ধূমায়িত অসন্তোষ ১০ই মে দিবশে মিরাট নগরে বিদ্রোহাগ্নি রূপে প্রজ্জ্বলিত হয়। তৎপূর্বে ৬ই মে তারিখে ৮৫ জন দেশীয় সৈনিক

কুচকাওয়াজের সময় টোটা নিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের কোর্ট মার্শালের বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

ফলে এতে অপরাপর সিপাহীরা তাদের ধর্মের জন্য নিপীড়িত বলে, সদলে বিদ্রোহী হয়ে ১০ই মে জেলের কয়েদিদের ছেড়ে দেয়, রাজকোষ লুণ্ঠন করে। অস্ত্রাগার হস্তগত করে অনেক ইংরেজকে হত্যা করে এবং অবশেষে দিল্লীর নাম মাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে পুনরায় রাজ সিংহাসনে বসিয়ে স্বাধীনতার পতাকা উড়াবার জন্য দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তারা ১১মে দিল্লী অধিকার করে। এই সংবাদ সারা দেশে প্রচারিত হলে, যে যে স্থানে সিপাহী সৈন্য ছিল, সর্বত্র বিশেষ উত্তেজনা দেখা দেয়। উপর্যুপরি বিদ্রোহাগ্নি চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়লে ফৈজাবাদের মৌলবী, বিঠুরে নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী ও নানার সেনাপতি তাঁতিয়ার টোপী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে অবতীর্ণ হন।

১৮৫৭ সালে জুলাই মাসে কলকাতায় জনরব প্রচার হয় যে বিদ্রোহী সিপাহীগণ কলকাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তারা কলকাতা শহরের সমুদয় ইংরেজদের হত্যা এবং কলকাতা শহর লুট করবে। এই জনরবে অনেক ইংরেজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় নিল এবং ইংরেজ ফিরিঙ্গী এবং দেশীয় খ্রীষ্টানরা অস্ত্রসহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়তে থাকে । এমন কি লর্ড ক্যানিং বাঙ্গালীদের "বটি ও কাটারি" কেড়ে নিতে অনুরোধ করলেন। বাঙালীদের বড় বড় রাজকর্ম থেকে বঞ্চিত করার প্রচেস্ট শুরু হয়। নীলকররা মিউটিনি উপলক্ষে দাদন, গাদন ও শ্যামাচাঁদ নির্বিচারে বাঙালীদের উপর "খেলাতে লাগলেন"। কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজরা এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে। কিন্তু তৎপূর্বে লক্ষ্ণৌর বাদশাকে গ্রেফতার করা হয় এবঙ গোঁড়া সেনাপতিদের লুটতরাজ, মার্শাল-জারী, ছাপাখানা স্বাধীনতা হরণ, কলকাতার বাঙালী সমাজের জন্য আতঙ্ক ও ভয়ের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালীর আত্মপরতা ও রাজনৈতিক অসচেনতা সে সময়ের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অনুষঙ্গ । শহরবাসী বাঙালী মধ্যবিত্ত মিউটিনির কারণ সমূহ রূপে ইংরেজ কর্তৃক খাঁটি হিন্দু ধর্মের বিনষ্ঠকে চিহ্নিত করলে কালীপ্রসন্ন সিংহের ব্যঙ্গের তুলি তাদের প্রকৃত স্বরূপ চিত্রণে দ্ব্যর্থহীন হয়ে ওঠে।

"বাঙালীরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে 'যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙালীই আচেন - বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মতো হতে পারেননি। পারবেন কি না তারও বড়ো সন্দেহ! তাদের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না- রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠতে হলে স্ত্রীর বা চাকরানীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অন্তরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান-তাঁরা যে লড়াই করবেন এ নিতান্ত অসম্ভব। বলতে কি কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েচেন। যদি

Dhaka University Institutional Repository

গবর্ণমেন্টের হুকুম হয়, তাহলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মতো এখনই ফিরিয়ে দ্যান- রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়- বিলাতি ফলারে বসেন ও ঘোষজ গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বানাতের ট্যানটুলেন ও বিলিতি বদমাইশি থেকে স্বতন্ত্র হন।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, মিউটিনি, পৃ ৯০)

বিশেষত বিদ্রোহ উত্তেজনা কালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত"হিন্দু প্রেট্রিয়ট নামে" সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রাজানুগত্য প্রকাশ এবং সিপাহী বিদ্রোহকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেনাদলের কার্য বলে অভিহিত করায় লর্ড ক্যানিং

এর মনোযোগ আকর্ষণ করে তবে নীলকরদের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে প্রবল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর প্রশংসায় কালীপ্রসন্ন সিংহ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৬০ সালে যখন একদিকে ইণ্ডিগো কমিশন ও পেট্রিয়টের সঙ্গে বিরোধ, বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপরদিকে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পন" নাটক প্রকাশিত হয়। " নীলদর্পণ" তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত থাকলেও পাদরী জেমস লং "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় এটির ইংরেজী অনুবাদ করেন। কারণ দ্বিতীয় রিভোলিউশনের আশঙ্কায় নীলকর সাহেবরা তৎকালীন গভর্মেন্টের সহায়তা প্রার্থনা করে এবং সরকারী সেনাদল মফস্বল এলাকায় সাধারণ জনগনের উপর চড়াও হয়। কিন্তু প্রজা সাধারণের দুরবস্থা শুনায় জন্য ইন্ডিগো কমিশন ভারত বর্ষীয় প্রজার দুর্দশায় সহানুভূতি প্রদর্শন করে। এই পিরিস্থিতিতে "নীলদর্পন" সৃষ্টি। কালী প্রসন্ন সিংহের ভাষায় ঃ-

"প্রজার দুরবস্থা শুনতে ইণ্ডিগো কমিশন বসলো, ভারত বর্ষীয় খুড়ীর চমক ভেঙ্গোলো। (খুড়ী একটু আফিম খান) বাঙ্গালি হয়ে ভারত বর্ষীয় খুড়ীর একজন খুড়ো কমিশন হলেন। কমিশনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো; সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দরুণ নীলকর দল হন্নে হয়ে উঠলেন- ছাইগাদা, কচুবন, ফেন গোজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরঘরে, গীর্জ্জেয় প্যালেসের ও প্রেসে তাগ কল্লেন! শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গোরিয়ার হাউণ্ড পাদরি লং সাহেবকে কাম্‌ড়ে দিলে !"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, হুজুক, পৃ ৯৪)

মূলত উনবিংশ শতাব্দীতে যে স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে তারই পরিণতিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ জীবন দৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল হয় মানবতাবাদ ও মানব কল্যাণের বিষয়। একদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বর্ষের রাজকার্য পরিচালনা, অন্যদিকে দেশীয় জমিদার ও রাজ কর্মচারীদের অমানবিক আচরণ জনজীবনকে সুদূর প্রসারী সঙ্কটে নিক্ষেপ করে। কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আবির্ভূত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্ত চিন্তা চেতনায় ধারণ করেছিলো প্রগতির ঝাণ্ডা। পরিবর্তনশীল সমাজে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল অধিপতিরা তাদের সব সময় উদারনৈতিক মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেননি। ফলে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল এই ইভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয় । তবে ইংরেজরা এ দেশীয় মানুষের ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি , রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাবেমূর্তিকে অপদস্থ করার প্রয়াস গ্রহণ করলে সচেতন বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে এদেশের মানুষের জন্য হিতকর যা কিছু তার স্বপক্ষে সর্বদা পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন । তৎকালীন ধনসুখ বিলাসী ধনী সন্তানদের মত তিনি অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতায় লিপ্ত হননি বরং যে আদর্শবাদে শেষ পর্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন তারই পরিণতিতে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়" তিনি সচেতন মানসিকতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র দুই খণ্ডে বিভক্ত এর প্রথম ভাগে ২৯টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ৪টি নক্‌শা রয়েছে। প্রথম খণ্ডে নক্‌শা সমূহের গঠনগত বৈশিষ্ট্য দুই প্রকারের যথাক্রমে- বৃহদাকার নক্‌শা ও ক্ষুদ্রাকৃতি নক্‌শা।

প্রথম খণ্ডের বৃহদাকার নক্‌শা-

১। কলিকাতার চড়ক পার্বণ
২। কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা
৩। নাককাটা বঙ্কু
৪। বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার
৫। মাহেশের স্নানযাত্রা
৬। ভূত নাবানো
৭। রমা প্রসাদ রায়
৮। মিউটিনি
৯। মহাপুরুষ
১০। মরাফেরা
১১। পাদরী লং ও নীলদর্পণ

প্রথম খণ্ডের - ক্ষুদ্রাকৃতি নক্‌শা-

১। হুজুক
২। ছেলে ধরা
৩। প্রতাপ চাঁদ
৪। লাল রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা
৫। কৃশ্চানি হুজুক
৬। আমাদের জাতি ও নিন্দুকেরা
৭। নানা সাহেব
৮। সাত পেয়ে গরু
৯। দরিয়াই ঘোড়া
১০। লক্ষ্ণৌয়ের বাদশা
১১। শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধায়
১২। ছুচোর ছেলে বুঁচো
১৩। জষ্টিস ওয়েলস্
১৪। টেকচাঁদের পিসী
১৫। রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল
১৬। বুজরুকি
১৭। হোসেন খাঁ

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে দ্বিতীয় খণ্ডে মোট চারটি নক্শাই বৃহদাকার-

১। রথ যাত্রা
২। দুর্গোৎসব
৩। রামলীলা
৪। রেলওয়ে

প্রথম খণ্ডের নক্শার বিষয় বস্তুতে প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন কলকাতা শহরের সমাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ সমূহ। এই খণ্ডের দীর্ঘ নক্শা সমূহের লেখক দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের আন্তর অসঙ্গতি উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরের রাজপথ থেকে রাজ প্রাসাদে মাঠে ময়দানে অলিতে গলিতে গঙ্গাবক্ষে প্রকাশ্য সভায় গোপন আসরে, আলোকিত উৎসব ও অন্ধকারাচ্ছন্ন শুড়িখানায় নির্বিকার চিত্তে যাতায়াত করেছেন। তিনি হঠাৎ ধনীর অসঙ্গত আচরণকে যেমন নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরছেন তেমনি বাবু সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপকে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন। একই সঙ্গে যুগসন্ধিক্ষণের আদর্শ শূন্য নীতি ভ্রষ্ট ও নবমূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে তৎকালীন শহরবাসী রক্ষণশীল প্রথাগত ও গোঁড়া দৃষ্টিকোণকে আক্রমণ করেছেন।

এখন্ডে-"জমিদার ও অবতার, ব্রাহ্ম ও পাদরী, কচি বুড়া ও ধেড়ে খোকা, মাতাল ও মোসাহেব, বাবু ও বাবাজী " এবং সমকালের ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি বর্গের বিচিত্র আচরণ ও অবদান তাঁর কলমের তীক্ষ্ণ আঁচড় থেকে রক্ষা পায়নি। সংক্ষিপ্ত নক্শা গুলোতে তৎকালীন সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিশেষত সমাজের কুসংস্কার তৎসঙ্গে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে সমাজ জীবনে উদ্ভূত নানা অসঙ্গতি এসব নক্শার মৌল প্রতিপাদ্য।

দ্বিতীয় ভাগে চারটি দীর্ঘতর নক্শা সমাজ চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্রণ প্রাধান্য পেয়েছে। একই সঙ্গে রেলওয়ে, বুকিংক্লার্ক ও স্টেশন মাষ্টার লেখকের ব্যঙ্গ শরে জর্জরিত হয়েছে।

নক্শার গঠন বিচারে দীর্ঘতর নক্শাগুলোতে লেখকের সময় ও সমকাল চিত্রণের দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ এসব অংশে লেখক অনুপুঙ্খ বর্ণনায় আবার কখনো নাটকীয় ঘটনার অবতারনায় বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছেন।

লেখক মূলত নাগরিক ব্যঙ্গকারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সমালোকের ও সমাজ শোধনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সমসাময়িক বাঙ্গালীর আচার আচরণ, রুচি, শিল্পবোধ, জীবনবোধ, রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভৃতির স্পষ্ট ধারণা কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্শায় অভিব্যক্ত। বিভিন্ন আখ্যান উপাখ্যান ও ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি কখনও আত্মজৈবনিক উপকরণে কখনো নিরাসক্ত দর্শকের ভূমিকায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান সমূহের অনুপুঙ্খ পরিচয়ে নির্মাণ করেন নক্শাপুঞ্জ । লেখক বিষয়ের সঙ্গে ভাষার যৌথায়নে পারঙ্গম। নক্শার ভাষা মূলত বর্ণনাত্মক। সাধুভাষার কাঠামোর বিপরীতে

Dhaka University Institutional Repository

চলিত ভাষা সহজ ও সরল লৌকিক ভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। লেখকের সংস্কৃতবহুল সমাসবদ্ধ শব্দের পরিবর্তে প্রচলিত শব্দের যথোপযুক্ত ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের 'নতুন গহনা ও সমাজের পক্ষে নতুন হেয়ালী' হিসেবে অভিহিত। দ্বিরুক্তিশব্দ, ধনাত্মক শব্দ ও অনুকার অব্যয়, বাগধারা , প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতির সমন্বয়ে সমকালীন গদ্য ভাষার বিপরীত নিজস্ব বাকভঙ্গির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া নির্বিচারে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, ও দেশী শব্দের সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন ইংরেজী ও আরবী, ফারসী শব্দসমূহ।

"শহরে টি টি পড়ে গ্যাচে, আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় হাফ আখড়াই শুনতে হবে। কি ইয়ার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফআখ্‌ড়াই শুনতে পাগল। বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো। কোঁচানো ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনির এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চারপুরুষে পাঁচপুরুষে ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা অকর্মন্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করেচিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুন্‌সি ও চাবির শিকলি হঠাৎ বাবুর

মতো স্বস্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হল- জুতোরা বেশ্যার মতো নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।"

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা, পৃ ৫৯)

লেখকের গীতিকার সত্তা ও কবি সত্তার আত্মপ্রকাশ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"র বিভিন্ন অংশে লক্ষণীয়। চরিত্র চিত্রণের পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রকৃতির অভিনব আবেষ্টনী বর্ণনায় লেখক তার কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

"পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোনো কোনো গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা যেমন মেয়েদের সাঁজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্বে পথের ধারের পুরনো শিবের মন্দির, ভাঙা কোটা, পুকুর পাড় ও ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে থাকে তেমনি অন্ধকারও এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাতকোর ভেতর ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন-এখন শাঁক ঘন্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন -তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে রমনী স্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচকে ছুড়ীদের আঁটা ভার- কুমুদিনীর মুখে হাসি আর ধরে না। নোঙর করা ও কিনারার নৌকাগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগলেন, বোধ হতে লাগলো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচতে লেগেচেন। বায়ুচালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে-কোনখানে বালির খালের নিচে একখানি পিনেস নোঙর করে বসেচেন- রকমারি বেধড়ক চলচে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদুমৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে।"

Dhaka University Institutional Repository

মীর মশাররফ হোসেন

মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল মহকুমার দেলদুয়ার গ্রামের জমিদার আবদুল হাকিম খান সাহেবের মৃত্যুর পর তার বিপুল সম্পত্তি তদারকের জন্য জমিদার পত্নী ও বেগম রোকেয়ার জৈষ্ঠ্য ভগিনী করিমননেসা খানম ও তার সন্তানদের পক্ষে দেলদুয়ার ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। দেলদুয়ার থাকাকালীন সময় মশাররফ হোসেনের সাহিত্য খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রে করিমননেসা খাতুনের স্নেহদৃষ্টি ও অনুপ্রেরণা এমনকি "শান্তিকুঞ্জ" নামে একটি বাড়ি প্রদান প্রভৃতি মীর মশাররফ হোসেনের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। দেলদুয়ার থাকাকালীন সময়ে মশাররফ "বিষাদ সিন্ধু" রচনা করেন এবং এর প্রথম সংস্করণ উৎসর্গ করেন শ্রীমতি করিমননেসাকে। কিন্তু ১৮৯২ খ্রীঃ দেলদুয়ার জমিদার গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত শুরু হলে মশাররফ হোসেন জমিদার গোষ্ঠীর বিভিন্ন তরফের মধ্যে আপোষ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে করিমননেসার রোষ দৃষ্টিতে পতিত হন। এ সময় মশাররফ হোসেন করিমননেসার "শান্তিকুঞ্জ" পরিত্যাগ করে স্বপরিবারে বসবাস শুরু করেন টাঙ্গাইলের থানা পাড়ার 'শান্তি কঠিরে'। দেলদুয়ার ষ্টেটের বিচিত্র দ্বন্দ্ব সংঘাত, করিমননেসার দ্বারা মিথ্যা মামলায় অপদস্থ হওয়া জমিদার গোষ্ঠীর বিভিন্ন পক্ষের ভণ্ড, হিতৈষী ও টাঙ্গাইল সরকারী কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সম্মিলিত বিড়ম্বনার প্রতিক্রিয়া মীর মশাররফের "গাজী মিয়ার বস্তানী" রচনার প্রধান কারণ হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে।

'তাঁর আত্মজীবনী' আমার জীবনীতে মশাররফ হোসেন উল্লেখ করেছেন যে, 'গাজী মিয়ার বস্তানীর অনেক ঘটনা তাঁর জীবন থেকে আহরিত। মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে করিমননেসা খানমের জমিদারীতে ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মনিবের বিরাগ ভাজন হয়ে পরে তাকে চাকুরীস্থল পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। এই কর্মস্থল দেলদুয়ারের অভিজ্ঞতাই তাঁর বস্তানী রচনার প্রধান উৎস।

(জাহাঙ্গীর, ১৯৯৩, পৃ- ২০০)

বস্তা শব্দের অর্থ বড় থলি, বোঝা প্রভৃতি। অন্যদিকে বস্তানী শব্দের আভিধানিক অর্থ ছোট থলি। অর্থাৎ যা অল্প পরিমাণের বোঝার উপযোগী। গাজী মিয়ার বস্তানী মশাররফ হোসেনের ওই রকমই 'ছোট থলি' যাতে স্থান পেয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব ও তীব্র অভিজ্ঞার ব্যঙ্গাত্মক বিবরণ। বস্তানীতে বস্তাবন্দী হয়েছে মশাররফের ব্যক্তিগত গাত্রদাহ। অক্ষয় কুমার মৈত্রের ভাষায়-

"বড় দপ্তরের নাম বস্তা, ছোট দপ্তরের নাম বস্তানীর সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। এই বস্তানী নাকি ২৪ নথিতে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে ২০ নথি আপাতত: পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

(জাহাঙ্গীর, ১৯৯৩, পৃঃ ২১৬)

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশের বিরূপতা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতিকূলতা ও বিচিত্র ব্যক্তির প্রবঞ্চনা মশাররফ হোসেনকে এ গ্রন্থ রচনায় প্ররোচিত করে। গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক হলেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনা। দেলদুয়ারের জমিদার পরিবারের করিমননেসা এ গ্রন্থে বেগম ঠাকুরান রূপে রূপায়িত। এছাড়া জমিদারদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার ও ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কোর্ট কর্মচারী ও থানার বর্ণনায় লেখকের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিকত হয়েছে।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' রচনা থেকে মীর মশররফের চিন্তাধারার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। "বিষাদ সিন্ধু"তে যে অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবতাবাদী ও নবজাগরণের দীক্ষামন্ত্রের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় তা আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় অনুপস্থিত। প্রধান কারণ হিসেবে সমসাময়িক পরিবেশের অনুদারতা ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও গ্লানিবোধ কার্যকর ছিল। আনিসুজ্জামানের ভাষায়-

"জীবনের ঐশ্বর্য নয়, বিকৃতিকেই তিনি এখানে বড় করে দেখিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নিজেই তার শিকার হয়েছেন"। (আনিসুজ্জামান, ১৯৭১, পৃঃ ২১০)

মুনীর চৌধুরী মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগপুরুষ অগ্রপথিক হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিবৈরী ভাবকে দায়ী করেছেন। তাঁর ভাষায়-

"সমাজের কল্যাণ সাধনে নিরুৎসাহ, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রচার বিমুখতা, মানুসের মহত্ত্বে অনাস্থা ইহলোকের সৌন্দর্যে অশ্রদ্ধা, সবই ১৮৯২ থেকে ১৯০২ এর মধ্যে তিল তিল করে দানা বেধেঁছে। মীরের শিল্পানুভূতি ক্রমশ পলায়মান শেষ আট দশ বছরের সংখ্যায় অনেক বই লিখেছেন বটে, কিন্তু পূর্বতন মীরের সত্যদৃষ্টি শিল্পদৃষ্টি দুই-ই এখানে অনুপস্থিত।
(চৌধুরী, ১৯৬৫, পৃঃ ২২)

মুনীর চৌধুরীর মতে মীর মানসের ক্রমবিকাশে প্রথম অধ্যায় দীনবন্ধু, মাইকেল, বঙ্কিমের সাহিত্যাদর্শের প্রভাব পরিপূর্ণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী চেতনা গৌরব সমুজ্জল। (চৌধুরী, ১৯৬৫, পৃঃ ১৭)

কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মৌল কাঠামোটি তিনি পেয়েছিলেন পূর্বসূরী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট থেকে। এ কারণে বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে "গাজী মিয়ার বস্তানী" রচনায় অনুপ্রানিত হয়েছেন তিনি। তবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন যুগের সৃষ্টি, যুগের প্রতিক্রিয়া, তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা ও অনূভূতির অনিবার্য প্রকাশ। অন্যদিকে মীর মশাররফ হোসেন ১৮৮৪ থেকে ১৮৯২ পযর্ন্ত দেলদুয়ারে অবস্থান কালে বিষাদ "বিষাদ সিন্ধু" ও "উদাসীন পথিকের মনের কথা"র মত মিল্প সৃষ্টি 'গাজীমিয়ার বস্তানী' রচনায় উৎসাহিত করেছে। গ্রন্থটি অতীত কালের একটি বৃহৎ দর্পণের নমুনারূপে আখ্যায়িত। বিশেষত এ গ্রন্থের ভেড়াকান্ত, ভেড়াকান্তের স্ত্রী স্বয়ং মীর মশাররফ হোসেন ও বিবি কুলসুম তার সত্যতা "বিবি কুলসুম

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এছাড়া এ রচানায়- "টাঙ্গাইল অরাজকপুর, দেলদুয়ার জমাদ্দার, নসিরাবাদ (ময়মনসিংহ) নচ্ছারপুর, পাথরাইল- পাতাল গ্রাম, সলিম নগর- কুলকুচ নগর প্রভৃতি আখ্যা পেয়েছে"। (গাজী মিয়ার বস্তানী, পৃঃ ১)

'গাজীমিয়ার বস্তানী' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০টি নথিতে। পরবর্তী সময়ে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত "আমার জীবনী" গ্রন্থে বস্তানীর অপর চারটি নথি সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থ সামাজিক নক্শা জাতীয় রচনা হিসেবে 'আলালের ঘরের দুলাল' 'হুতোম প্যাচার নক্শা' প্রভৃতির সমগোত্রীয়। উনবিংশ শতাব্দীর নব শিক্ষিত ও নব্য ধনিক শ্রেণীর রেখাচিত্র হিসেবে চিহ্নিত 'আলালের ঘরের দুলাল'। অন্যদিকে 'হুতোম প্যাচার নক্শা'। তৎকালীন দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত বিচিত্র অসঙ্গতির ব্যঙ্গচিত্র।

'কমলাকান্তের দপ্তর'এ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী সমাজ জীবনকে গভীর উপলব্ধি দিয়ে হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ রচনায় গভীর জীবনবোধের আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়। এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে পরিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও ব্যক্তিগত অপমান ও লাঞ্ছনা ক্রিয়াশীল ছিল। অন্যদিকে মীর মশাররফ হোসেনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কারণ বিদ্যমান তবে 'আলালের ঘরের দুলাল' 'হুতোম প্যাচার নক্শা' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই ত্রয়ীগ্রন্থের কয়েকটি গুণ আলোচ্য গ্রন্থে বর্তমান । হুতোম তদানীন্তন কলকাতার একটি রস রচনামুলক বিচ্ছিন্ন আলেখ্য, আলাল সমাজের রেখাচিত্র সমন্বিত জীবন সমালোচনাজাত অপূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আর 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর প্রত্যেকটি দপ্তরই হাস্যরস ও জীবনের অনুধ্যান জাত স্বয়ং সম্পূর্ণ ছবি। 'গাজী মিয়ার বস্তানীতে' এ তিনটি গুণই একত্রে দেখা যায়।

(জাহাঙ্গীর, ১৯৩, পৃঃ-১৯৪)

তবে অনেকে 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র সঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' যোগসূত্র স্থাপনে আগ্রহী। কমলাকান্তের দপ্তর অনুকরণে এ গ্রন্থটি রচিত হলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে সুদূর ব্যবধান।

"কমলাকান্তের দপ্তর" সরস ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্কলন। এখানে কমলাকান্তের ব্যক্তিত্বের সৌরভই সকল বক্তব্যের প্রাণ। অহিফেন সেবন ছলনা মাত্র। মৌতাতের পর যখন কমলাকান্ত বসে বসে ঝিমোয় তখনও দেশ সমাজ, শিল্প ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম সম্পর্কে তার বিচার দৃষ্টি ও অনুভূতি শক্তি সুতীক্ষ্ণ রূপে জাগ্রত, তার প্রতিটি বক্রোক্তি এক প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। এসব গাজী মিয়া সম্পর্কে বলা চলে না। গাজী মিয়া যা পছন্দ করেন না, সরাসরি তার দফা নিবেশ করার পক্ষপাতী। যা পছন্দ করেন তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

(চৌধুরী, ১৯৬৫, পৃঃ- ৯৭)

'গাজী মিয়ার বস্তানী' বহুবিচিত্র ঘটনা বিজড়িত একটি অসম্পূর্ণ শিথিলবদ্ধ রচনা হিসেবে বেশী স্বীকৃত। লেখকের কল্পিত নামের

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরালে সমকালের সমাজচিত্র রূপায়ণে বিচিত্র ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করতে দেখা যায়। গাজী মিয়া তার বস্তানী শুরু করেছেন অরাজকপুরের হাকীম ভোলানাথ ও কুঞ্জ নিকেতনে বেগম পয়জারননেসা সম্পর্কে বর্ণনার মধ্য দিয়ে। আরাজকপুরের হাকিম সাহেব ও শাসন কর্তা ভোলানাথ, বেগম সাহেবার সৈন্য শব্দের অর্থ নির্ণয় ঋতুরাজবাবুর মন্তব্য ও অন্যান্য সঙ্গে সে বাক্যালাপ ও কথোপকথনে সংকীর্ণমন ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ্যে বেগম সাহেবার প্রশংসা করলেও অন্তরালে তার কথায় ও কাজের নিন্দাবাদ লক্ষ করা যায়। ভোলানাথ হাকিম, বেগম সাহেবের মনস্তুষ্টির জন্য ও তার সহাচার্য লাভের আশায় নিজের ক্ষমতা প্রদার্শন করে দাগাদারী ও ভেড়াকান্তকে জেল হাজতে পাঠিয়েছিলেন । ভেড়াকান্ত ওরফে গাজীমিয়া আত্মগ্লানি থেকে জেল হাজতে পাঠিয়েছিলেন।

ভেড়াকান্ত ওরফে গাজী মিয়া আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বস্তানীর সৃষ্টি করেন। এজন্য হাকিম ভোলানাথ, ঋতুরাজ, বক্রেশ্বর, ছোটবাবু, সবলোট চৌধুরী, চৌকিদার, কনষ্টেবল, দারোগা, ইনস্‌পেক্টর বাবু, সাবরেজিষ্টার, সাব ডেপুটি, মুন্সেফ, শিক্ষক, উকিল, মুক্তার, জেলখানার ডাক্তার, সুদখোর মহাজন ফিরিববাজ নায়েব, গোমস্তা ধরিবাজ, ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও পরিচয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান চরিত্র পয়জারননেসা, মনিবিবি, সোনাবিবি চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

জমাদ্বারের একমাত্র পুরুষ জমিদার সবলোট চৌধুরীর চরিত্রাঙ্কন দিয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় নথির সূচনা হয়েছে। সবলোট চৌধুরীর সঙ্গে তার অপকর্মের এজেন্ট দল খানসামা ও গুপ্তইয়ার পাজীখা, বেহায়া শেখ, মরদূত খাঁ প্রভৃতির বৈশিষ্ট উন্মোচিত হয়েছে সবলোট চৌধুরী জমিদারদের কলহের উভয় পক্ষকে সমর্থন ও টাকা লুটের অপপ্রকৃতির প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয় নথিতে কুঞ্জনিকেতনের হাকিম সাহেবের জন্য আয়োজিত নিমন্ত্রণের অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও হাকিমের সঙ্গে বেগমের সম্পর্কের নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

চতুর্থ নথিতে সোনাবিবি ও মনিবিবির শত্রুতা ও কলহের বিবরণ রয়েছে। মনিবিবির লোভ ও নীতিজ্ঞানহীনতা ও তার কাণ্ড কলাপের সহায়তাকারী মোক্তার তুড়ুক পাছাড়, ঘরভাঙ্গা সান্ন্যাল, মাথা পাগলা লহিড়ী, ক্ষাপা কালকুটরায়, পেটভরা গৃহ উনপাজুরেমোষ, কীলচোর বাগছি, ঘসাপয়সা, উলটপালট খাঁ, বেল্লীক মুন্‌সী, বদহজম প্রভৃতির স্বরূপ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে।

সোনাবিবির একমাত্র পুত্র জয়ঢাক কিভাবে মনিবিবির কন্যা ছিড়িয়া খাতুনের সঙ্গে বিবাহের পর নিজের পক্ষে আনার জন্য মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন তার বিবরণ পঞ্চম নথিতে বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সোনাবিবির পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্পর্কে ভ্রাতা দাগাদারীর গ্রেফতার কাহিনী এই নথিতে স্থান পেয়েছে। দাগাদারীর মতই মোক্তার ধিনতাধিনা, ধামাধরা সরকারকে বেআক্কেল, তেনাচোরা, আরশূলা, ধড়িবাজ, চোট্টামিয়া প্রভৃতি সোনাবিবির পক্ষের লোক। এছাড়া সোনাবিবির অধীনস্ত কর্মচারীর অন্যতম সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা ভেড়াকান্ত মীর মশাররফের আত্মস্বরূপ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ নথিতে গাজী 'গাজী মিয়া' পৃথক পৃথক উপস্থাপনায় নথি সমূহের সংযোগ সূত্রের কথা বলে বেগম সাহেবের চরিত্র উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। বিশেষত বেগম সাহেবের আত্মকথনে তার বিলাসিতা আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিকেতনের রাধিকা রূপে ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে ঋতুরাজের সঙ্গে ভেড়াকান্তকে জেলে ঢুকানোর কথোপকথন। বড় উকিল বাবুর মাতলামি ও বেগম সাহেবার অন্দর মহলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুরাজের পলায়ন দৃশ্য এই নথিতে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

সপ্তম নথিতে দাগাদারীর জামিনে মুক্তি ও মোক্তার ধিনাতাধিনা বাবুর এবং ভেড়াকান্তের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় জমিদার জ্বালাতুন্নেসা ভেড়াকান্তের নাম শুনতে পারেন না অথচ ভেড়াকান্ত অন্যায় অত্যাচার প্রতিকারের চেষ্টা করেন। মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও তোষামোদ বর্জন করে। সোনামনির দীর্ঘ বিলাপ এই নথির উল্লেখযোগ্য দিক। সোনামনির মলিন, নীরব, রুক্ষ চেহারা তার সন্তান জয়ঢাকের প্রতি অনুরাগ এবং একই সঙ্গে জয়ঢাকের মাতৃবিরোধিতার কথা উচ্চারিত হয়েছে।

অষ্টম নথিতে সোনাবিবির কারাযাপন, তার আর্তনাদ ও কয়েদ থেকে মুক্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জয়ঢাকের পক্ষ থেকে ইনস্‌পেক্টার সাহেবের নিকট আপত্তি উপস্থিত হলে নাবালক জয়ঢাকের অস্থাবর সম্পত্তি না নিয়ে গৃহ ত্যাগ করতে পারে সোনাবিবি।

সোনাবিবি গৃহ ত্যাগের সময় জয়ঢাক কর্তৃক লাঞ্ছনা এই নথির অন্যতম ঘটনা।

অভিজাত সমাজের নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক দুর্নীতির চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ জীবনের শঠতা, প্রবঞ্চনা, লাঞ্ছনার বাস্তব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

নবম নথিতে মফঃস্বলের হাকিমের বিচার পদ্ধতির চিত্র উন্মোচিত হয়েছে হয়েছে। মনিবিবি এবং সোনাবিবির লাঠিয়াল বাহিনীর দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্ভাবনা সংবাদ এবং তাদের সংঘাতের ইতিবৃত্ত হাকিম বাহাদুর কর্তৃক কোটবাবুর রিপোর্ট শ্রবণ এবং ঋতুরাজ, বড়বাবু প্রভৃতির কথোপকথন উল্লেখযোগ্য অংশ। এছাড়া সোনাবিবির কলহপ্রিয় বিবাদ প্রবল মনোভঙ্গি, ভেড়াকান্তের রাজভক্তি ও সোনাবিবির একমাত্র মন্ত্রদাতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দশম নথিতে মনিবিবি ও তার কন্যাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। একই সঙ্গে মনিবিবির সঙ্গে মাথা পাগলা, ঘরভাঙ্গা ও বদ-হজমের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। সেনাবিবি ও তার সমর্থনকারীদের অনিষ্ট চিন্তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। অন্যদিকে ভিখারিণীর চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে মনিবিবি ও তার কন্যাদের অন্তর্জগতের কথা ব্যক্ত করেছে। সোনাবিবির কয়েদমুক্তি ও মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থান ও অরাজকপুরের বিচিত্র মন্তব্যের সূত্রে সমাজ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে একাদশ নথিতে। সোনাবিবির সঙ্গে দাগাদারী ও ভেড়াকান্ত ও মোল্লাজীর কথোপকথন ও মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি অনুষঙ্গ একাদশ নথিতে বর্ণিত।

দ্বাদশ নথিতে কুঞ্জ নিকেতনের ইতিহাস ও বেগম সাহেবার পরিচয় বিস্তৃত ভাবে উন্মোচিত। বেগম সাহেবের অন্তঃপুরে 'গাজী মিয়ার বস্তানী' গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের অভ্যন্তরে কতিপয় পত্র পাঠকদের কৌতূহলী করে তোলে। বেগম সাহেবার সঙ্গে ব্রহ্মভাই দলের সম্পর্কের বর্ণনা এই অংশের অন্যতম প্রান্ত। ভোলানাথ হাকিমের সঙ্গে বেগম সাহেবের সম্পর্ক বর্ণনা দ্বাদশ নথির উল্লেখযোগ্য দিক।

ত্রয়োদশ নথিতে মনিবিবির বিরুদ্ধে লাল আলুর মোকদ্দমা প্রত্যাহার করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ভিখারিনীর এ কার্যে ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে ছিড়িয়া খাতুনের প্রাক বিবাহ ও বিবাহোত্তর ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।

চতুর্থশ নথিতে সোনাবিবি ও মনিবিবির বৃত্তিভোগী, বেতনভোগী লাঠিয়ালদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা বিধৃত হয়েছে। নেঙ্গটিচোরা গ্রামের খাজনা আদায় উপলক্ষে মনিবিবি ও সোনাবিবির লাঠিয়াল বাহিনীর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও দারোগা বাবু সোনাবিবির লাঠিয়াল বাহিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার কাহিনী এ নথিতে স্থান পেয়েছে।

অষ্টদশ নথিতে ঋতুরাজ বাবু কর্তৃক জলসার আয়োজন; তার গৃহে আমোদ প্রমোদ মুহূর্তে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিদের দ্বারা শায়েস্তা হওয়ার ঘটনা কৌতুককর বর্ণনায় উন্মোচিত হয়েছে।

বিশেষত ঋতুরাজ বাবুর গৃহের সামনে প্রাচীন মসজিদ থাকা সত্ত্বেও তার মুসলিম ধর্ম বিদ্বেষ প্রসূত মানসিকতা এই ঘটনার জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনার পশ্চাতে ভেড়াকান্তের ভূমিকা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ষোড়শ নথিতে বিচারালয় ও বিচার কর্তার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। বিচার কার্যের অসঙ্গতির ব্যঙ্গ চিত্র মশাররফের মৌল অন্বিষ্ট। দাগাদারীর হাজত বাস এ নথির উল্লেখযোগ্য দিক। একই সঙ্গে হাকিম সাহেব জয়ঢাকের সঙ্গে তার মাতা সোনাবিবির আপোষ নিষ্পত্তির পরামর্শ এখানে উল্লেখিত হয়েছে। বেগম ঠাকুরাণের সঙ্গে দাগাদারীর সম্পর্ক উন্মোচন ও বেগম ঠাকুরাণ এবং সোনামনির প্রারম্ভিক সংলাপ এই অংশের অন্য প্রান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ নথিতে মনিবিবির মৃত্যু উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এই অংশে সবলোট চৌধুরী জয়ঢাক ও অন্যান্যদে আপোষ মীমাংসার উদযোগ ও ভেড়াকান্তর দুইশত টাকার জামিনে মুক্তি পাওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত।

অষ্টাদশ নথিতে সোনাবিবির যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস ও ভিখারিণীর ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ভেড়াকান্তের স্ত্রীর পরিচয় ও সোনাবিবির সাথে তার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। জনৈকি মহাপুরুষের কথা এ প্রসঙ্গে ভিখারিণীর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। ভেড়াকান্তের মোকদ্দমার হয়রানি ও তার দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এই অংশের উল্লেখযোগ্য দিক।

ভেড়াকান্তের জেল জীবনের অভিজ্ঞতা অষ্টাদশ নথির বিশিষ্ট দিক। তার কারাবাস সূত্রে কারাগারের বাস্তব চিত্র এই অংশে উন্মোচিত হয়েছে।

উনবিংশ নথিতে ভেড়াকান্তের কারামুক্তির জন্য তার স্ত্রীর প্রচেষ্টা ও তার জামিনে খালাস লাভ ও আপীলের মোকদ্দমার তদবিরের জন্য জেলা মহকুমায় গমন এবং জনৈতিক আত্মীয় ব্যারিষ্টারের মোকদ্দমায় সওয়াল জবাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং জেল থেকে খালাস পাওয়া কিন্তু ভোলনাথ ডেপুটির ওয়ারেন্টের ভয়ে প্রকাশ্যে অরাজকপুরে না আসা সংগোপনে নিজ গৃহে অবস্থান ও অবশেষে সকল দণ্ড থেকে ভেড়াকান্তের মুক্তি এই অংশে বর্ণিত।

বিংশ নথিতে সোনাবিবির দুর্দশার জন্য দাগাদারীর অপকর্মকে দায়ী করা হয়েছে। দাগাদারী আপন স্বার্থে সংযুক্ত দলিল তৈরী করে সোনাবিবির সঙ্গে প্রতারণা করতে চেয়েছে। কিন্তু দাগাদারীর সেই আবেদন ভেড়াকান্ত ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় বাতিল হয়েছে। সোনাবিবি নিযুক্ত গুরুজীর অন্তর্ধান এবং সোনাবিবির আলি, অছি পথ থেকে অব্যাহতি লাভ অবশেষে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে জন্মভূমির মায়া, সন্তানের মায়া পরিত্যাগ করে মহাতীর্থ মক্কাধামে গমন এই নথির উল্লেখযোগ্য দিক। অন্যদিকে দাগাদারীর করুণ পরিণতি এই নথিতে বর্ণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত কাহিনী সূত্র অবলম্বনে 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র চরিত্র চিত্রণ, সমাজচিত্র, ভাষাভঙ্গির বিবেচনা এর সাহিত্যিক মূল্যায়নের জন্য অনিবার্য অনুষঙ্গ।

তিন বিধবা মহিলা জমিদার পয়জারননেসা ওরফে বেগম সাহেবা বা বেগম ঠাকুরাণী, মনিবিবি ও সোনাবিবি চরিত্রের মাধ্যমে মীর মশাররফ হোসেন "গাজী মিয়ার বস্তানী"র কাহিনী নির্মাণ করেছেন। এছাড়া ভোলানাথ হাকিম, ভেড়াকান্ত দাগাদারী ও জয়ঢাকের চরিত্র উল্লেখযোগ্য পয়জারননেসা অরাজকপুরের ধনবতী সুন্দরী জমিদার। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী ও অনুগতদের সঙ্গে মুসলিম সমাজের অবরোধ প্রথাকে অবজ্ঞা করে অবাধে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তিনি। তার বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের পশ্চাতে ক্লেদাক্ত বিবর্ণ বাস্তবতা উন্মোচন মশাররফের অন্যতম কীর্তি। অল্প বয়সে স্বামী হারা বেগম ঠাকুরান শেষ জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

লাঞ্ছনা ও দুর্গতির শিকার হন। বেগম ঠাকুরান যে ভেড়াকান্তকে জেল-হাজতে ভুগিয়েছিল সে ভেড়াকান্ত 'বস্তানী' রচনায় বেগম সাহেবার চরিত্র রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে পয়জারননেসার মতই মনিবিবি সমদ্ধারের জমিদার হওয়া সত্ত্বেও চরম পরিণতির শিকার হয়েছেন এই গ্রন্থের শেষাংশে। স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা কর্মচারী লাল আলুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ও জামাতা জয়ঢাকের মাতৃ সম্পত্তি গ্রাস করার পরিকল্পনা প্রভৃতি অপকর্মের শেষ পরিণতি দুরারোগ্য ব্যাধি; কুষ্ঠ রোগের মাধ্যমে মৃত্যু যন্ত্রণার সমাপ্ত হয়।

লেখক দ্বাদশ কন্যার জননী মনিবিবির মৃত্যু যন্ত্রণার দৃশ্য নির্মমভাবে তুলে ধরেছেন।

সোনাবিবির চরিত্র বঞ্চিত নারীর যন্ত্রণার চিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মনিবিবির কন্যা ছিড়িয়া খাতুনের সঙ্গে সোনাবিবির পুত্র জয়ঢাকের বিবাহ এবং বিবাহোত্তর বিচিত্র ঘটনায় জয়ঢাক ও মনিবিবি কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হওয়া এবং দুগ্ধ ভ্রাতা দাগাদারী তার (সোনাবিবির) সম্পত্তি দখলের হীন চক্রান্ত, সোনাবিবিকে সংসারের সকল বন্ধন ও মায়া ত্যাগ করে মক্কা তীর্থে নিয়ে গেছে।

ধূর্ত, প্রতিহিংসা পরায়ণ ও স্বার্থপর দাগাদারীর শেষ পরিণতিও করুণ। অরাজকপুরের হাকিম ও শাসনকর্তা ভোলনাথ অসৎ লোভী ও সংকীর্ণমনা, এমনকি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে নয়।

বেগম সাহেবার সাহচর্য ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দাগাদারী ও ভেড়াকান্তকে কারাগারে আবদ্ধ রাখে সে। ভোলানাথ চরিত্রটি মীর মশাররফ ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শরে উন্মোচন করেছেন। অন্যদিকে সমদ্ধারের জমিদার সবলোট চৌধুরী, সোনাবিবি ও মনিবিবির বিরোধ সৃষ্টিকারী অর্থলোলুপ ও অপকর্মের দলনেতা রূপে চিত্রিত।

ভেড়াকান্ত বা গাজী মিয়া মশাররফ হোসেনের আত্মপ্রতিবিম্ব হিসেবে চিহ্নিত। সে পোড়া মুসলমান কিন্তু নচ্ছারপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ভেড়াকান্তের মধ্যদিয়ে মশাররফ হোসেন তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ ও স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

গাজী মিয়ার বস্তানীতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সামন্ত অধিপতির নৈতিক চরিত্র এবং তৎকালীন সমাজের সামাজিক দুর্নীতি উন্মোচিত হয়েছে। সমাজজীবনের বিচিত্র ঘটনা মামলা মোকদ্দমা প্রতারণা উৎকোচ গ্রহণ শঠতা ও প্রবঞ্চনার বিশ্বস্ত চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে যুগের সংস্কার বিশ্বাস ও সমাজে নারীর অবস্থান ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"উত্তরবঙ্গের দুই মহিলা জমিদারের বিবাদ বিরোধ এই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। স্থানীয় বড় লোক মুসলমানের জীবনযাত্রা, জমিদারী আমলার কুকীর্তি, পুলিশের দুর্নীতি পরায়ণতা, মফঃস্বলের হাকিমদের খামখেয়ালীপনা, ইত্যকার বিচিত্র নমুনা গাজী মিয়া অতি বাস্তব ও স্পষ্ট রেখায় চিত্রিত করেছেন।" (চৌধুরী, ১৯১৫, ১০৫-১০৬)

গাজী মিয়া ব্যক্তিগত জীবনের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা থেকে সমাজ ও ব্যক্তির নির্মম সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনায় শত্রুতা মূলত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রসূত ও দলগত স্বার্থ প্রণোদিত। স্পষ্টবাদী হওয়ায় গাজী মিয়ার সমালোচনা ব্যঙ্গের কষাঘাতে আত্মপ্রকাশ করেছে। চরিত্র রূপায়ণে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক বাক্যবিন্যাস অপ্রকাশ করেছে। চরিত্র রূপায়ণে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক বাক্যবিন্যাস অপ্রকাশ থাকেনি।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' বাংলাদেশের একটি মফঃস্বলের ধনবান অসৎ নরনারীর যাবতীয় অপকর্মের বিশ্বস্ত চিত্র। নরনারীর চরিত্র রূপায়ণে ও তাদের পারস্পরিক আচার আচরণ বর্ণনায় লেখক ব্যঙ্গ কষাঘাত নিক্ষেপ করেছেন। বেগম সাহেবার সঙ্গে ব্যঙ্গিগত রেষারেষির জন্য তার চরিত্র গাজী মিয়ার বর্ণনায় ব্যঙ্গময় হয়ে উঠেছে।

যেমন পঞ্চদশ নথিতে ঋতুরাজের গৃহে বেগম ঠাকুরানীর নিমন্ত্রণ ও আকস্মিক আক্রমণের প্রেক্ষিতে লাঞ্ছিত হওয়ার যে চিত্র পাওয়া যায় এবং ষোড়শ নথিতে দাগাদারির সঙ্গে বেগম সাহেবার সম্পর্ক উন্মোচন লেখকের কৌতুক হাস্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"মানুষের চাপনে পেষণে বেগম ঠাকুরাণীর জেকেট ছিড়িল, ব্লেচ হারাইল, গলা শরীর আরও গলিয়া পিষিয়া পশম উঠিয়া লালে লাল হইল। ------ এদিকে কাহার কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, কাহার কোথায় বোতলের খাপরায় ঝড় ভাঙ্গা কাঁচের টুকরায় কাটিয়াছে, ক্ষতির আলোকে দেখিতে লাগিলেন। উকিল বাবুরা প্রায়ই চম্পট দিয়াছিলেন, দুই তিনজন মাত্র আশার পথ চাহিয়া ঘরের কোনে চিকের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণটি রক্ষা করিয়াছিলেন। কেহ কোন কথা কহিতেছেন না। বেগম ঠাকুরানী বাতির আলোক দেখিলেন, তাঁহার শরীরে স্থান বিশেষ গণ্ডে ও বক্ষে রক্ত জমিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। পালকী বেহারা আনাইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া নির্বিবাদে বিদায় হইলেন।"

(গাজী মিয়ার বস্তানী, ২৫২-২৫৩)

বেগম ঠাকুরানের দৈহিক রূপসজ্জা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাব-আচরণ, বাক্যালাপ, গাজীমিয়ার দৃষ্টিতে বেমানান অসঙ্গতিপূর্ণ ও কৌতুককর মনে হয়েছে। এই জন্য বেগম সাহেবার যাবতীয় অপকর্ম ও অপকীর্তি বিবৃত হয়েছে নগ্নভাবে। ঋতুরাজের জবানীতে বেগম সাহেবার নিম্নোক্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

"হাঁ! হাঁ! সেই যাত মরদের গ্রীবা ভঙ্গকারিণী, এটর্নী উকিল ব্যারিষ্টারের মনোমোহিনী, চটালো কালোপেড়ে সুচিরূপে শুভ্র দশ গজা ধুতির নিম্নে সামিজধারিণী, পরিধান বসনের পরিপাট্য দেখাইতে কোমল দেহের মলাত্রম ও স্থূল ক্ষীণ, মাংসল মানানসইর প্রমাণ করিতে, স্থানে স্থানে সুবর্ণ রজত মক্ষিকা প্রজাপতি, ভ্রমর আকৃতির ব্রেচধারিণী, বিশাল নিতম্ব দোলানী, পাতি হাঁস গামিনী, হস্তিদণ্ড বিনন্দিত শুভ্র বদনী।" (চৌধুরী, ১৯১৫, ২৮২-৮৩)

এছাড়া তৃতীয় নথিতে হাকিম ভোলনাথের অন্তরঙ্গ ও উচ্ছ্বসিত আবেগে মুসলমান জমিদার বেগম পয়জারননেসার রূপ যৌবন বিত্ত বৈধব্য ঐশ্বর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে প্রশংসার সঙ্গে কটাক্ষপাত, বেগম সাহেবার পরিপূর্ণ বিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে গাজী মিয়ার বিকৃত বর্ণনা হাকিম ভোলানাথকে দিয়ে কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্তরঙ্গ আলাপন প্রভৃতি ব্যঙ্গকারের বিদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পঞ্চম নথিতে শিকল কাটা টিয়ে বেগমকে পরিত্যাগ করে সিমলায় অন্তর্ধান করলে গাজী মিয়া শোক সন্তপ্ত বেগম সাহেবার হৃদয়ের প্রাণবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাতে লেখকের ব্যক্তিগত বিদ্রূপ প্রবণতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"রে, টিয়ে কাটা শিকল! তুই নিরেট জিঞ্জির। তোর হৃদয় নাই; তোর প্রাণ নাই। তোর কিছুই নাই, তুই কামারের হাতুড়ীয় ঘা খেক লোহা। কত সাধলেম, কত সাধ্য সাধনা কল্লেম, কত মিনতি কল্লেম, পায়ে ধল্লেম, মাথার চুল পায়ে ঘসে ঘসে কটা কল্লেম, বুকে মুখে, বুক মুখ মিশালেম, কতবার লম্বা চৌড়া দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ প্রকাশের নিশ্বাস ফেল্লেম, আর বশে আসল না। আর হৃদয় পিঞ্জরে বসল না। আগুন পোড়া বুকের কত প্রকারে তা দিলাম, পাখি আর পোষ মানল না। দুকটি দুধ দেখালাম পোড়ার মুখ ফিরেও চাইল না।" (গাজী মিয়ার বস্তানী, পৃ ৬০-৬১)

হৃদয় কঠিন ঋতুরাজ বাবুকে নিজের অধীনে আনার জন্য ষষ্ঠ নথিতে কৌশল প্রয়োগ এবং অষ্টাদশ নথিতে যে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করেছে তার বর্ণনায় ব্যঙ্গ দৃষ্টি প্রযুক্ত হয়েছে। ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে আঘাত করা ব্যক্তিগত বিদ্রূপে এ আঘাত অনেক সময় স্থূলতায় পর্যবশিত হয়েছে। যেমন দ্বাদশ নথিতে বেগম উকিল বাবুকে অন্তরঙ্গ পরিবেশ রচনার মধ্যদিয়ে যে আচরণ প্রকাশ করেছে, শিকল কাটা টিয়ে নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে বেগম সম্পর্কে যে আর্তনাদ উচ্চারণ করেছে কিংবা হিন্দু ব্রাক্ষণ ভ্রাতাদের সঙ্গে এক জোট বেগম কর্তৃক ফরিয়াদ কীর্ত্তনের আয়োজন করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গাজী মিয়ার বিদ্রূপ ও রঙ্গরস প্রবণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"কি মজা! ঘরে বাইরে বেগম! ধর্ম্ম গানে আখি ঠারো কেনরে বেগম? ইহারা তোমার কে? গায়ে গায়ে মিশামিশি, পাছা-পিঠা ঘেষা-ঘেষি কেন রে বেগম? ছি ছি! আবার পিরিতি প্রণয়মাখা আখিঠার। ও ! ছি ছি! এ না ধর্ম্মের গান? তওবা, তওবা, হাজার তওবা! এই তোমার ধর্ম্মের গান! ঐ মাথা নাড়িয়া মাজাদোলাইয়া, নূপুর বাজাইয়া, খোলা ঢোলে আঘাত করিয়া, ও দুটি তোমার কে? ..... এ ক্রিয়ার নাম কি? মাঝে মাঝে হরি বোল হরির বোল

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছ; - সে কোন হরি? হিন্দু হরি? না তোমাদের হরি? ..... ও! ছি ছি! সকলেই তোমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। সে চাউনির ভাব কি? তা ভ্রাতারাই জ্ঞাত আছেন। তোমার হাত তোলা হরি বোলেব ভাব, গায়ের বডী, পরনের শাড়ী, চক্ষের চাউন, জোড়া ভ্রুর কাল ভঙ্গিমা, বেহদ্দ বাহার যেন তন্ন তন্ন করে দেখছেন, আর তালে তালে পা ফেলছেন কিন্তু সংকীর্ত্তনের বোল গোলেমালেই গেলে হরিবোল হচ্ছে।

(গাজী মিয়ার বস্তানী, পৃ-১৮১-১৮২)

ঋতুরাজের জবানীতে বেগম সাহেবার যে বর্ণনা নবম নথিতে রূপায়িত হয়েছে তা সপ্তদশ নথিতে গাজীমিয়ার দৃষ্টিতে আরো নগ্ন ও রঙ্গরসে পূর্ণ হয়ে উন্মোচিত হয়েছে।

"ত্রস্তপদে.... পালকিতে উঠিয়াই পালকির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। চারজন মজবুত বেহারা অতি কষ্টে পালকি ঘাড়ে করিয়া, ঘাড় নোওয়াইয়া দ্বার বিশেষে বায়ু ত্যাগ করিতে চলিল"। (গাজী মিয়ার বস্তানী, পৃ-৩০৫)

ভেড়াকান্ত সোনাবিবির পক্ষের লোক। এ কারণে গাজী মিয়ার বর্ণনায় সোনাবিবির বেগম সাহেবার মত উদ্ভট ও কুৎসিত রূপ ধারণ করেনি বরং সহানুভূতি ও সংযম বেশীর ভাগ অংশে লক্ষণীয় কিন্তু গাজী মিয়া সোনাবিবির সঙ্গে দাগাদারীর সম্পর্ক এবং সকল কর্মের পরামর্শদাতা বেআক্কেল তেনাচোর প্রভৃতি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি।

"সোনাবিবি দাগাগারীর মাতার দুধ পান করিয়াছেন। বিবির কটিতে আছেন, একভাবে একত্রে এক সাথে আহারাদি করেন। জয়ঢাক নাবালগ, সুতরাং অনধিকার প্রবেশ অনিবার্য।" (গাজী মিয়ার বস্তানী, পৃ-১৪২)

এ ছাড়া পঞ্চম নথিতে দাগাদারী প্রথমবার পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলে সোনাবিবি, দাগা আমার দাগা প্রভৃতি বলে ইনস্পেকটর সাহেবকে উদ্দেশ্য করে যে আর্তনাদ করেছে তাতেও গাজী মিয়ার ব্যঙ্গ দৃষ্টি সক্রিয়।

গাজী মিয়া মনিবিবির দুঃখ দুর্দশা আচার-আচরণ ব্যাধি, গ্লানি, অপমান, কর্ম জীবনের নানা অনুষঙ্গ এবং তার মেয়েদের কুকাণ্ড যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে তার আক্রমণ ও হুল এবং শরবর্ষণের কৌতুককর দিক সমূহ অজ্ঞাত থাকেনি।

তাছাড়া লাল আলু সম্পর্কে গাজীমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যঙ্গরস প্রকাশিত হয়েছে। লাল আলু মোল্লাজী মনিবিবির উপর স্বামী স্বত্ব দাবী করে মোকদ্দমা করা সত্ত্বেও মনিবিবির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক মনিবিবি জানালে সে মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বকেশ্বর ঋতুরাজের কথপোকথনে লেখকের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের খোচা অব্যর্থ হয়ে উঠেছে।

"লাল আলু মোকদ্দমা তুলে নিয়েছে। দরখাস্তে বলেছে যে, আমার এই ক্ষণে স্ত্রীর প্রয়োজন নাই বয়স দোষে ইন্দ্রিয় আদি শিথিল হয়েছে, আর স্ত্রীর আবশ্যক নাই। ঋতু-বাবা! দরখাস্ত দাখিল সময় ইন্দ্রিয় আদি সটান ছিল, ছয় মাস যেতে যেতে শিথিল হলো? দশ বার হাজারের কমে আর শিথিল হয় নাই।"

টুকরো টুকরো উদ্ভট কৌতুকাবহ ঘটনা ব্যঙ্গবিদ্রূপে চিত্রিত হয়েছে। কাহিনী বিন্যাসের সূক্ষ্ম চাতুর্য ও সংগঠনের সামগ্রিক ঐক্য বিধানের চেয়ে সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি আশ্রয়ী চিত্র, অসঙ্গতির চিত্র 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে রূপায়িত হয়েছে। বিচারালয় ও জেল খানার নক্সা বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি ভঙ্গির অন্যতম নিদর্শন।

"এই কি ধর্ম্মাসন? এই কি রাজাধিকরণ? এই কি বিচারালয়? ধর্ম্মের অবতার বিচারকের বসিবার স্থান? এই কি রাজদরবার? হ্যাঁ! এই অরাজকপুরের বিচারগৃহ। বিচারাসনে বিচার কর্ত্তা হাকিম বাহাদুর..... যথাস্থানে পেস্কার, সম্মুখে নথিপত্র কাগজ।..... সময় সময় হাকিম বাহাদুরের মুখে দুই একটি কথা, চুরুটের ধূম সংযুক্ত চাপা চাপা কথা। বিচার কার্য্যও চলিতেছে..... তামাক খাওয়ার কাজটা চুরুটেই উঠিতেছে। বিচার আসনে যিনি বসিয়াছেন, মিটিমিটি ভাবে চাহিতেছেন, সমগ্র মুখে সমতানীর ডাবল খেলা খেলিতেছে চিনিতে পরিয়াছেন কি? এ দুশমন চেহারার কটা চক্ষের কটকটে চাহনী দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন কি?

(গাজী মিয়ার বস্তানী, ষোড়শ নথি, পৃ-২৬৩)

গাজীমিয়া সমাজ সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমাজ সংস্কারের জন্য বিচিত্র চরিত্র ও বিচিত্র ঘটনার বিবরণ বস্তানীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্যঙ্গকার বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় নিজের জন্য যে গর্বিত আসন সৃষ্টি করেন তার ফলে অন্যের দোষ ও দুর্বলতা সহজে বিদ্রূপের খোচায় বিদ্ধ করেন। অর্থাৎ ব্যঙ্গকার ক্ষমাহীন, মানুষকে ব্যথা দিয়েই তাঁর আনন্দ।

মীর মশাররফ হোসেনের "গাজী মিয়ার বস্তানীর" ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য। তিনি বস্তানীতে যে সমাজ চিত্র অঙ্কন করেছেন কিংবা যে সব চরিত্র বাস্তবের উপর রং লাগিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার আবেদন সার্বজনীন।

বস্তুত মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা থেকে উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশের মফঃস্বলের যে চিত্র উন্মোচন করেছেন তা অনন্য। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে শব্দ ব্যবহারের চাতুর্যে ও বাক্যের অনিবার্য বিন্যাসে 'গাজী মিয়ার বস্তানী' ব্যঙ্গাত্মক রচনা হিসেবে সার্থক না হলেও উক্ত রচনা বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ গদ্যের অসামান্য দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সমকালীন সমাজের ভণ্ডামী ও অবিচারের বিরুদ্ধে সত্যনিষ্ঠ লেখকের শানিত ব্যঙ্গ কৌতুকের লেখনী নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। সমাজ সংস্কার ও সমাজ কল্যাণের প্রত্যাশা থেকে তাঁর গদ্য রচনার সূচনা।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮২২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯১৯ সালে ৩রা ডিসেম্বরে মৃত্যু বরণ করেন। শিক্ষকতা ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী কাজে কর্মজীবন অতিবাহিত করে ১৮৯৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য কর্মের সূচনা হয়। ১৮৯৩ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কঙ্কাবতী' প্রকাশিত হয়। তার পর পরই রচিত হয় 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'ফোকলাদিগম্বর' (১৯০১), 'মুক্তমালা' (১৯০১) প্রভৃতি গ্রন্থ।

'কঙ্কাবতী' ও 'ভূত ও মানুষ' তাঁর ব্যঙ্গ রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম যুগের অবসান এবং রবীন্দ্র যুগের সূচনা লগ্নে ত্রৈলোক্যনাথ সাহিত্য চর্চায় অবতীর্ণ হন। তাঁর ব্যাপক জীবন অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও কৌতুকধর্মী চরিত্র সৃজন এবং কাল্পনিক ঘটনা ও রূপকথার পরিবেশ রূপায়ণ তাঁকে সমকালের স্বতন্ত্র লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে।

ভারত বর্ষের অতীত ঐতিহ্যের পুনঃজীবন নয় বরং সমকালীন সমাজের অজ্ঞতা কুসংস্কার বর্ণবৈষম্য ও ভাষা ও জাতিগত ভিন্নতার প্রসঙ্গ প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় দীক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মানব কল্যাণ ও সংস্কার মুক্তি সম্ভব। ত্রৈলোক্যনাথ এই বিশ্বাসে আস্থাশীল হয়ে তাঁর ব্যঙ্গ রচনাসমূহে মানবতাবাদ ও সমাজ সংস্কারে সচেতনতার সৃষ্টি করেছেন।

এসব রচনায় একটি প্রধান গল্প বা চরিত্রের সূত্রে উদ্ভট অলৌকিক রূপকথা সুলভ উপাদানের আশ্রয়ে মানবেতর জীবও প্রাণীর উপস্থিতিতে ব্যঙ্গ রচনা সমৃদ্ধ হয়েছে।

'কঙ্কাবতী' গ্রন্থের প্রথম ভাগে পনেরটি পরিচ্ছেদে প্রাধান্য পেয়েছে কুসুম ঘাটি গ্রামের সামাজিক অবস্থা। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাগে উপস্থাপিত হয়েছে কঙ্কাবতীর স্বপ্ন সূত্রের উদ্ভট ও কাল্পনিক কাহিনী।

গ্রন্থটির প্রথম ভাগে, কুসুমঘাটি গ্রামের সামাজিক জীবনের একটি বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত তনুরায়ের অর্থলোলুপতা, বৃদ্ধ জামিদার জনার্দন চৌধুরীর কূটচক্র ও জমিদারের সভাপণ্ডিত গোবর্দ্ধন শিরোমণির অনাচার, ষাড়েশ্বরের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি, সুপণ্ডিত নিরঞ্জন কবিরত্নের সহৃদয়তা, রামহরির পরোপকারী মনোভাব প্রভৃতি চরিত্রের আচরণে গ্রাম্য সামাজের অনাড়ম্বর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জনার্দ্দন চৌধুরীর পত্নীবিয়োগের পর কঙ্কাবতীকে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করায় গ্রামীণ জীবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার সঙ্গে কলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী খেতু অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়ে। খেতুকে বরফ খাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রাম্য সমাজ এক ঘরে করে দেয়। কুসুমঘাটি গ্রামের সংকীর্ণতা ও সামাজিক জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাধিসমূহ লেখকের ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। মূলত 'কঙ্কাবতী'র সামাজিক ব্যঙ্গ হিসেবে উল্লিখিত চরিত্রসমূহ আবির্ভূত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে কঙ্কাবতীর পিতা তনুরায়ের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। তনুরায় ত্রিসন্ধ্যা দেবতা ও ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন, ধর্মকর্ম বিষয়ে কুলীন বংশের সন্তান হিসেবে আচার সর্বস্ব, আবার বংশের ধর্মানুসারে কন্যা দান করে পাত্রের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে দ্বিধাহীন। নিজের বিয়ের সময় পৈত্রিক জমি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিল বলে, তার নিজের আচরণেও কন্যা বিক্রি করে টাকা রোজগার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তনুরায়ের তিন কন্যা। দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়ে হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ উপার্জন করেছে এবং তার দুই জামাতার বয়স বেশি হওয়ায় কিছু দিনের মধ্যেই কন্যা দুটি বিধবা হয়। তনুরায়ের পুত্রটিও পিতার মত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মত আচরণের পরিপোষকতা করে।

মূলত তনুরায়ের সুবিধাবাদী শাস্ত্রতত্ত্ব অর্থলোলুপতাকে লেখক ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তনুয়ায়ের পাড়ায় এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণের পুত্র খেতুর পরিচয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে তনুরায়ের প্রতিবেশী নিরঞ্জন কবিরত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। তনুরায়ের সঙ্গে নিরঞ্জন পণ্ডিতের বিরোধ ও জমিদার জনার্দ্দনের সঙ্গে তার কলহ এবং নিরঞ্জনের আর্থিক দৈন্যের সময় জমিদারের ছাত্রদের আগমন প্রভৃতি বিষয় এই পরিচ্ছেদে প্রাধান্য পেয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে খেতুর কলকাতায় বিদ্যা অর্জনের জন্য বিদায় যাত্রার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে খেতুর মা ও তনুরায়ের স্ত্রী প্রসঙ্গে কঙ্কাবতীর পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে খেতুর ও কঙ্কাবতীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। নবম পরিচ্ছেদে বার বছর বয়সেই স্বনির্ভর হয়ে উঠার কাহিনী। কঙ্কাবতীকে খেতুর পাঠদানের অনুষঙ্গ বিবৃত হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদে খেতুও কঙ্কাবতীর প্রসঙ্গক্রমে রামহরির স্ত্রীর বিবরণ পাওয়া যায়। একাদশ পরিচ্ছেদে কঙ্কাবতীর বিবাহ বিষয়ে তনুরায়ের অর্থলোলুপতা লেখকের শ্লেষ মিশ্রিত দৃষ্টিতে উন্মোচিত ।

"দেবীরূপী কঙ্কাবতীকে সহসা বিসর্জ্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে দুরন্তর অর্থলোভও অজেয়। ত্রিভুবন মোহিনী কন্যাকে বেচিয়া তিনি বিপুল লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আজ সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া ফেলেন? তনুরায়ের মনে আজ দুইভাব। এরূপ সঙ্কটে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।" (মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৩, ,পৃঃ ৫৮)

একই সঙ্গে তনুরায়ের দ্বন্দ্ব এই পরিচ্ছেদে লক্ষ করা যায়। অবশেষে তনুরায় খেতুর সাথে কঙ্কাবতীর বিয়েতে সম্মতি প্রদান করেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ষাড়েশ্বর ও খেতুর প্রসঙ্গে ষাড়েশ্বরের কলকাতার জীবন যাত্রার ব্যঙ্গাত্মক পরিচয় রূপায়িত হয়েছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জনার্দ্দন চৌধুরী কঙ্কাবতীকে বিয়ে করার আগ্রহ ও পাগলামীর চিত্র অঙ্কিত। অর্থের বিনিময়ে বৃদ্ধ জমিদার বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করলে কুসুমঘাটি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে ষাড়েশ্বের, গোবর্দ্ধন, জনার্দ্দন কর্তৃক খেতুর খাওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য চতুর্দশ পরিচ্ছেদে গদাধর ঘোষের জবানবন্দী রঙ্গ-ব্যঙ্গের তুলিতে অঙ্কন করা হয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কুসুমঘাটি গ্রামে বরফ খেয়ে খৃষ্টান হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত খেতুকে এক ঘরে করার ঘটনার বিবরণ এবং একই সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিকারগ্রস্থতার সূচনা প্রাধান্য প্রাপ্ত।

প্রথম ভাগে, পনেরটি পরিচ্ছেদে কুসুমঘাটি গ্রামের হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল সমাজপতিদের হীনমন্যতা, কাপুরুষোচিত ভণ্ডামীকে ব্যঙ্গ শ্লেষের কষাঘাতে লেখক জর্জরিত করেছেন।

'কঙ্কাবতী'র দ্বিতীয় ভাগে বিকারগ্রস্ত কঙ্কাবতীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত রূপকের মাধ্যমে রূপায়িত। কঙ্কাবতীর রূপকথার মাছ, পশু, মশা, ব্যাঙ, ভুত প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীর মাধ্যমে কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক ব্যঙ্গের চিত্র অঙ্কিত।

স্কল, স্কেলিটন এন্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী স্কল এর বিবৃতিতে এবং ভূত কোম্পানীর ইংরেজী নামকরণের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় বাঙালীর দাস সুলভ মনোভাবের পরিচয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে। ইংরেজ সাহেবদের প্রতিটি কথাকে বেদ বাক্য মনে করা হলেও দেশীলোকদের কেউ বিশ্বাস করত না। এ কারণে স্কল ও স্কেলিটন সে যুগের শিক্ষিত ও বাস্তববোধ সম্পন্ন বাঙালীর প্রতিনিধি।

ত্রৈলোক্যনাথ এই রূপকের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের অসঙ্গত আচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন। ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ভূত ও নাকেশ্বরী ভূতনীর বিবাহ ও প্রতিবেশী ভূতদের আচরণ অত্যন্ত কৌতুককর করে উপস্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে।

ছেলে মেয়ের বিবাহের সময় সমাজে প্রতিবেশীদের যে হীন আচরণ প্রকাশ পায় তারই বাস্তব চিত্র ভুতের কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ সামাজিক বিদ্রুপ একইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যাঙ সাহেবের ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র উপস্থাপনে।

ব্যাঙের কাহিনীতে বাঙালী চরিত্রের ইংরেজ অনুকরণের সমকালীন যুগসত্য লক্ষ করা যায়। হাতী কর্তৃক অভিহিত থ্যাবড়ানাকী ব্যাঙ অপমানিত হয়ে সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে মিষ্টার গমিশে রূপান্তরিত হয়। কাহিনীর এ পর্যায়ে ব্যাঙ সাহেবের স্বীকারোক্তি স্মরণীয়ঃ

"শুনিলে তো এখন? হাতির একবার আস্পর্দ্ধা কথা ! তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেই জন্য এই সাহেবের পোষাক পরিয়াছি। কেমন? আমাকে ঠিক সাহেবের মত দেখাইতেছে তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয়, করিবে যখন রেল গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে না।
টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব।
সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে,

Dhaka University Institutional Repository

আর বলিবে, 'ও গাড়ীতে সাহেব রহিয়াছে !'
কেমন কঙ্কাবতী! এ পরামর্শ ভাল নয়? "

(মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৩, পৃঃ ২০৩-২০৪)

আজগুবি কাহিনীর পরিচয় দ্বিতীয় ভাগে এয়োদশ থেকে উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই অংশে মাশাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং খর্ব্বুরের বিচিত্র দাম্পত্য কলহের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতেও ব্যঙ্গের অনিবার্য কষাঘাত লক্ষণীয়। মশাদের তিন সতীনের ঘোরতর বিবাদ তৎকালীন সামাজিক জীবনের বহু বিবাহের প্রতীক। লেখকের ব্যঙ্গ দৃষ্টি প্রাধান্য প্রাপ্ত। খর্ব্বুরের দাম্পত্য জীবনের কলহের একটি বিবরণ স্মরনীয়ঃ

"যখন আমাদের মারামারি হয়, তখন আমার স্ত্রী নাগরা জুতা লইয়া ঠন ঠন করিয়া আমার মস্তকে প্রহার করেন। আমি তত দূর নাগাল পাই না; আমি যা মারি তা কেবল তাঁর পিঠে পড়ে। স্ত্রীর প্রহারের চোটে অবিলম্বেই আমি কাতর হইয়া পড়ি, আমার প্রহারে স্ত্রীর কিন্তু কিছুই হয় না। সুতরাং স্ত্রীর নিকট আমি সর্ব্বদাই হারিয়া যাই। একে মার খাইয়া, তাতে মনঃক্লেশে, শরীর আমার শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দেহে আমার রক্ত নাই। যে জন্য মহাশয় রাগ করিতে পারেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কি করিব? আমার অপরাধ নাই।"(মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৩,পৃঃ ২৩৮)

মশা, খর্ব্বুর ও কঙ্কাবতী নাগেশ্বরী ভূতনীর হাত থেকে খেতুকে উদ্ধার অভিযানে ব্যাঙ সাহেবও হাতির সহায়তা লাভ করে। খোক্কোশ শাবকের পিঠে চড়ে কঙ্কাবতীর আকাশ যাত্রা ও নক্ষত্রের বৌএর সঙ্গে কথোপকথন ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদের মূল বিষয়। চাঁদের সঙ্গে কঙ্কাবতীর কথোপকথনে এবং দুর্দ্দান্ত সিপাহির সহায়তায় পুনরায় আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করার কাহিনী অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে লক্ষ করা যায়।

উনবিংশ পরিচ্ছেদে খেতুর মৃত্যু ও শ্মশান ঘাটে তার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ঘটনা এবং একই সঙ্গে কঙ্কাবতীর সহমরণ যাত্রার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে কঙ্কাবতীর আরোগ্য লাভ ও খেতুর সঙ্গে মিলনকাহিনীর প্রাধান্য লক্ষণীয়।

" কঙ্কাবতীর পূর্ববর্তী কাহিনী পর্যন্ত বিকারের ঘোরে স্বপ্ন জগত থেকে পুনরায় বাস্তব সমাজ প্রাঙ্গনে তার পরিণতি অঙ্কিত। অদ্ভুত কাহিনী ও অদ্ভুত চরিত্রের রূপায়ণে ত্রৈলোক্যনাথ কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছেন। চাঁদের শিকড়, এক টাকার ভূমিকম্প, নরমুণ্ড লইয়া নারিকেলমুখী ও লাউমুখী ভাঁটা খোলা, কুমীরের পেটে জীবন্ত গহনাপরা সাওতাল রমণীর নিশ্চিত অবস্থান, মানুষের অর্ধদেহের সহিত গোরুর কোমর ও পাদদ্বয়ের অপূর্ব সংযোগ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ও নাকেশ্বরীর শুভ পরিণয় ইত্যাদি অদ্ভুত ও অভাবনীয় ব্যাপারে যেমন লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি বাঘ-জামাই, ভূত-কোম্পানী, ব্যাঙ সাহেব, চন্দ্র লোকের দুর্দ্দান্ত সিপাহী, মাতাল ভূত, খাঁদাভূত, সাহেব ভূত, নাকেশ্বরী ইত্যাদি উদ্ভট চরিত্রও তিনি অত্যন্ত সরলভাবে অঙ্কন করিয়াছেন।"

(ঘোষ,১৯৬০,পৃঃ ৩৩৮)

বস্তুত অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সামাজিক ব্যঙ্গের শাণিত কষাঘাত বর্ষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গের শর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজের লোভ ও স্বার্থপরতা, নীচতা, নির্মম ও কুটিলতা ব্যঙ্গের অব্যর্থ শরে উন্মোচিত হয়েছে ' কঙ্কাবতী' গ্রন্থে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প সংগ্রহ 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬)। 'কঙ্কাবতীর' কাহিনীতে ভূতের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে লেখক সামাজিক মানুষের আচার আচরণকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

কারণ উক্ত গ্রন্থে ভূতদের আচার আচরণ সামাজিক মানুষের অনুরূপ। 'ভূত ও মানুষ' গল্প গ্রন্থে 'বাঙ্গাল নিধিরাম', 'ধারবালা', 'লুল্লু' ও 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' এই চারটি গল্পে সামাজিক ব্যঙ্গের প্রাধান্যই পরিস্ফুট।

'বাঙ্গালনিধিরাম' গল্পে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। চাকুরী উপলক্ষে লেখককে দু'বার বিলেত যেতে হয়। কিন্তু দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে তাঁকে নিজ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। নিধিরামের নৌযাত্রার দুঃসাহসিক কাহিনী এবং লুল্লু কাহিনীর বিবরণে সেই বাস্তব রূপ প্রতিফলিত।

'বাঙ্গাল নিধিরাম' সাতটি অধ্যায়ে সমাপ্ত উপন্যাসের আঙ্গিকে রচিত নিধিরামের জীবন কাহিনী। ৪৫ বৎসর বয়সে নিধিরাম পত্নীবিয়োগের পর গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যে বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং দুঃখ কষ্ট শেষে করুণ পরিণতি লাভ করে, তার বিবরণী গল্পের মূল ধারা। নিধিয়াম এক কড়ির কন্যা হিরন্ময়ীর জন্য যে শ্রম ও যন্ত্রণা লাভ করে তাতে এ গল্পের করুণ রসের দিকই প্রধান হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মূল গল্পের ধারাবাহিকতায় যে সব শাখা কাহিনী অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর মাধ্যমে লেখকের সামাজিক ব্যঙ্গই গুরুত্ব প্রাপ্ত। বিশেষত পঞ্চম অধ্যায়ের মড়া পোড়ানোর দলের কথোপকথন ও উদ্ধব দাদা এবং রামেশ্বের খুড়ুর কাহিনী বর্ণনায় লেখকের কৌতুক রস স্ফটিকায়িত হয়েছে। বিশেষত ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগে মড়া পোড়ানোর দলের লাশ হারানো ও নিধিয়ামকে অভিযুক্ত করানোর মূল কাহিনীর সংযুক্তিতার অন্যতম অংশ। এ অধ্যায়ে মদ্যপানকে কেন্দ্র করে উদ্ধব দাদা ও অন্যান্যদের কথোপকথনের একটি স্মরণীয় উদ্ধৃতিঃ

"এক জন বলিলেন, "উদ্ধব দাদা মদটুকু খাওয়া আছে, আবার টিকিটিও রাখা আছে।" উদ্ধবদাদা উত্তর করিলেন, "ওহে তোমাদেদর টিকি না রাখিলে চলে, আমার চলে না। বংশজ ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় নাই। কাওরানীর ঘরে থাকি, দেখা শওরানীর ভাত খাই। কেহ কিছু গোল তুলিলে সাক্ষাৎ অমনি টিকিটি খাড়া করিয়া ধরি। বলি, এই দেখ বাবা, টিকি আছে। অমনি সবাই চুপ, আর কথাটি কয়ার যো থাকে না।"(মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৬, পৃঃ ২৮)

মূলত ত্রৈলোক্যনাথ এই গল্পে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার ও সংস্কার নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তৃষ্ণার্ত নিধিরামকে জল দিতে সংকুচিত ব্যক্তির কাহিনীতে এই সত্য উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় গল্প 'বীরবালা'তে ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভট কাহিনী কল্পনার পরিচয় লক্ষণীয়। এই গল্পটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বীর হনুমান, অমাবষ্যা বাবাজী, ঘোমটাবতী, সবুজ ভূত, সাহেব ভূত ও পোষাড়ার পিঠে–এসব বিভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে লেখক কল্পনার রাজ্য থেকে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের সর নিক্ষেপ করেছেন। অযোধ্যার কাহিনী লেখকের কল্পনার ডানায় ভর করে বাগদাদের মক্কায় সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলে ও মরুচারী উঠের পিঠে বিস্তার লাভ করেছে।

এ গল্পের চরিত্রে নামকরণের ভিতর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে। গল্পটিকে অনেকেই স্বপ্ন নির্ভর উদ্ভট রূপক কাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

'লুল্লু' গল্পে এগারটি অধ্যায়ে ভূত প্রেত ও অলৌকিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের কষাঘাত লক্ষ করা যায়। সামাজিক আচার ও সংস্কারের হৃদয়হীনতা ও সংকীর্ণতার প্রতি ব্যঙ্গই এখানে মূল উপজীব্য দিক। এ গল্পে কঙ্কাবতীর ঘ্যাঁথো ভূত ও নাকেশ্বরী ভূতনীর পুনরায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ মুরুব্বি ভূতের কথায় ইংরেজী পড়া বাবুলোকদের আচরণ মুদ্রিত। এই গল্পের সূচনায় দিল্লীকালা আমীর শেখের লুল্লু কর্তৃক স্ত্রী অপহৃত হওয়ার কাহিনী অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তী সময় লুল্লু ভূতই গল্পের মূল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। গল্পটির অধিকাংশ কাহিনী ভৌতিক জগতের কিন্তু ভূতদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত মন্তব্য গুলো সামাজিক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমীর খ্যাঁ খ্যাঁ ও নাকেশ্বরী বিবাহে দুনিয়ার ভূতদের নিমন্ত্রণ সম্পর্কে লুল্লু যে কথা বলেছে তাতে সামাজিক জীবনের ধর্মের সংকীর্ণতার প্রকাশ হিসেবে গুরুত্ববহ। কারণ ভূতদের মত তৎকালীন সমাজের লোকদের ধারণা ছিল সমুদ্রের অপর পাড়ে পদক্ষেপ করলে জাতিকুল ভ্রষ্ট হতে হয়। লুল্লুর মন্তব্য স্মরণীয়ঃ

"মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত আদেশই আমাদের শিরোধার্য। তবে কিনা, আমরা ভারতীয় ভূত। ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারিনা। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকাভাণ্ড স্পর্শে গলিয়া যায়, সেই রূপ সমুদ্র পারের স্পর্শ লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্ন মাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন, নর হউন, কি বানর হউন, তিনিও মতিভ্রষ্ট হইবেন। যারপক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা, দিবারাত্রি তাঁহাদিগের পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কল্মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্মটা টায়ে টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়"। (মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৬, পৃঃ ৪৯)।

অন্যদিকে খবরের কাগজ সম্পর্কে আমীর যে মন্তব্য করেছেন, তাতেও সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের অশ্লীল গালাগালি ছাড়া পত্রিকার অন্য কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর সমকালে লক্ষণীয় ছিল না বলেই ধারণা করতে অসুবিধা হয় না। গোঁ গোঁ সম্পর্কে আমীরের মন্তব্যটি স্মরণীয়ঃ

Dhaka University Institutional Repository

" আমীর বলিলেন, 'আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতরে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি সম্পাদক করিব'। গোঁ গোঁ বলিল, 'আমি যে লেখা পড়া জানি না। আমীর বলিলেন, 'পাগল আর কি! লেখা পড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস ত? গোঁ গোঁ বলিল 'ভূতদিগের মধ্যে যেসব গালি প্রচলিত আছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আবার চাই কি? এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষ যা কিছু গালি জানে, এখন দেশ শুদ্ধ লোককে ভূতে গালি দিন। আমার অনেক পয়সা হইবে।"

(মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৬,পৃঃ ৩৮)

এই গল্পে ভৌতিক বিবাহের ঘটকালীর বিবরণ, বিরহ জর্জরিত ঘ্যাঁঘ্যোঁর অবস্থার বর্ণনা, সঙ্গীত বিশারদ তাঁতী ও নব্য সভ্য ভূত লুল্লু এবং খাঁনিমর্দিত ঘ্যাঁ ঘোঁ প্রভৃতির বিচিত্র কৌতুককর ঘটনা মূলত বাস্তব মানুষকে নিয়েই রঙ্গ ব্যঙ্গের জগত নির্মাণের অনুরূপ। 'ভূত ও মানুষে'র সর্বশেষ গল্প 'নয়নচাঁদে'র ব্যবসায় শাখা কাহিনীর বিচিত্র প্রবাহে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শাণিত হয়ে উঠেছে। সামাজিক অন্যায় আবিচার ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে লেখক এখানে ব্যঙ্গের শর উচ্চকিত করে তুলেছেন। ফরাস ডাঙ্গার সুবিখ্যাত গুণির আসরে কয়েকজন গুলিখোর সমবেত হয়ে সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা জমিয়ে ফেলেছে। এর প্রধান কথক নয়নচাঁদ। গল্পের সূচনায় গুলিখোরদের তর্ক-বির্তক ও গল্প গুজব গল্পের পটভূমি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। নয়নচাঁদের শীতলা ব্যবসার বিচিত্র কাহিনী কিছুদূর অগ্রসর হয়ে শুরু হয়েছে গগণ সুবলের কাহিনী। পুনরায় আবার নয়নের গল্প শুরু হয়েছে । কর্তা ভূতের কাহিনীর সঙ্গে "সেই আকুড়ে দাদা" কাহিনী একীভূত হয়ে মূল কাহিনীকে গতিশীল করেছে। নয়টি পর্বে নয়নচাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্রের কৌতুককর দৃশ্য অঙ্কন করা হয়েছে। ধর্ম ব্যবসায়ী নয়নচাঁদের মন্তব্য স্মরণীয়ঃ

"আগে যদি একগুণ পসার ছিল, এখন দশগুণ পসার হইল। কলেজের সেই যারা এম.এ পাশ দিয়াছে সভা করিয়া তাহারা শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিক লোকসব হাঁড়ি চড়ানো বন্ধ করিয়া খই খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম।" (মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৬ ,পৃঃ ৬৫-৬৬)

হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের অসারতা, দেবার্চনা ভণ্ডামী, খাদ্য অখাদ্য বিচারে অত্যাধিক গুরুত্বদান ও ধর্ম ব্যবসার নানা বুজরুকির প্রতি লেখক ব্যঙ্গের চাবুক চালিয়েছেন।

মূলত লেখকের রঙ্গ কৌতুকের আড়ালে সামাজিক ব্যঙ্গের অনিবার্য প্রকাশ লক্ষণীয়। 'ভূত ও মানুষ' ত্রৈলোক্যনাথের সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যঙ্গাত্মক রূপায়ণের অনন্য দৃষ্টান্ত। বস্তুত 'কঙ্কাবতী' ও 'ভূত ও মানুষ' ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ে ব্যঙ্গ রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য।অসম্ভব ও অলৌকিক কাহিনীর কল্পনা সৃষ্টিতে আপাত দৃষ্টিতে সমাজ বহির্ভূত অনুষঙ্গ মনে হলেও আসলে ঐ আবরণের মাধ্যমে সামাজিক ব্যঙ্গকেই সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। বাস্তব সমাজ থেকে ভূত প্রেতের জগতে পরিভ্রমণ একই উদ্দেশ্যের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক গল্প রচনায় ভূতের অস্তিত্ব বর্ণনায় মানব সমাজেরই ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছেন। অধিকাংশ ভূতই মানুষের বিকল্প এবং সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই সব ভূতকে সামনে রেখে ব্যঙ্গের শর নিক্ষেপ লেখকের অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে রক্ষণশীল ধর্মাসক্তির ফলে যেসব লেখক প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হন তাঁদেরই অন্যতম প্রতিনিধি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও নবজাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্মেষে ধর্ম, সমাজ ও বিশ্বাস সম্পর্কে যেসব মূল্যবোধের সূচনা হয়েছিল তাকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করাই ছিল রক্ষণশীল লেখকদের অন্যতম কাজ। বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উদার ও সার্বভৌম হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেও এরা ব্যর্থ হন। বিশেষত নারীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, নারীপুরুষের সমান অধিকার, জাতিধর্ম নির্বিশেষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন প্রভৃতি অত্যন্ত গর্হিত ও সমাজ ক্ষতিকর বিষয় হিসেবে এঁদের দ্বারা আখ্যায়িত হয়।

"ইন্দ্রনাথ এই লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন। সেজন্য তাঁহার লেখাতেও প্রগতিবাদী সমাজ রূপের প্রতি তীব্র উপহাস এবং পুরাতন বিধিব্যবস্থার জন্য সুগভীর মমত্বই ধরা পড়িয়াছে ব্রাহ্মধর্মের উদার ও উন্নত আদর্শ, বিধবাবিবাহ পুনঃপ্রচলনের প্রচেষ্টা, জাতিভেদ দূরীকরণের আন্দোলন স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপক প্রভাব ইত্যাদি বিষয় লইয়া তিনি তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আসর জমাইয়াছেন বাক সর্বস্ব, তরল ভাবাশ্রয়ী ও দুর্বলচিত্ত বাঙালী যুবকদের ভারত উদ্ধারের চেষ্টা ও তাঁহার শ্লেষ কন্টকিত লেখনীর মুখে প্রকাশিত হইয়াছে।" (ঘোষ, ১৯৮৮ পৃ. ঃ ৩৩৬-৩৩৭)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন আদর্শনিষ্ঠ সমাজের অচল ও অনুপযোগী রীতিনীতিগুলোকে যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। গুরুগম্ভীর উপদেষ্টার মত সমাজ সংশোধনকারীর মত লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর লেখায় সমসাময়িক কালের ব্রাহ্মধর্ম ও তাঁর অনুসারী ব্যক্তি আইন আদালত, জমিদার স্বায়ত্তশাসন ও পৌরব্যবস্থা, হত্যা এবং সমাজের অন্যান্য অসঙ্গতি ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository

রূপায়িত হয়েছে। 'কল্পতরু'তে লেখক ব্যঙ্গ দৃষ্টির শাণিত আলোয় সমাজের সামগ্রিকতাকে স্পর্শ করেছেন। সমকালীন সমাজে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজে গতিশীলতার ও অগ্রগতির সূচনা হয়। সে কারণে 'কল্পতরু'তে ব্রাহ্মধর্মানুরাগীদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রশংসিত ও অধিকাংশ লেখকের দ্বারা ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত হলেও এটিতে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের সামগ্রিকতা অনুপস্থিত। ২১টি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি রচিত হলেও কাহিনীর বিভিন্ন অংশে পারম্পর্য না থাকায় চরিত্রের বিকাশ নির্দেশে লেখকের আগ্রহ না থাকায় 'ব্যঙ্গ হাস্য গল্প' হিসেবে 'কল্পতরু' অভিহিত হওয়ার যোগ্য। অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও পল্লবিত বর্ণনা তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মৌল অংশ মূলত ব্রাহ্ম সমাজের আচার আচরণ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তিনি ব্যঙ্গ চিত্রগুলো অঙ্কন করেছেন

''কল্পতরু'' গ্রন্থে রানাঘাটের বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণকারী বাইশ বছরের তরুণ ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সদস্য। নবীন সদস্য হিসেবে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ে তার অপরিসীম উৎসাহ। এই নরেন্দ্রের বাসার সামনের গলিতে বাপান্তবাগীশের দাসী এবং ভ্রাতৃবধূকে সৎ প্রসঙ্গের পরামর্শ দিতে গিয়ে রামদাসের নীচতায় ও প্ররোচণায় বিড়ম্বিত অবস্থার মধ্যে পড়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে যেতে হয়। নরেন্দ্রের বাড়িতে কোন সংবাদ না পৌঁছাতে তার পিসীমার অনুরোধে মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র রায়ের অনুসন্ধান তৎপরতার অভিযান সূচিত হয়। ইন্দ্রনাথ কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথ নয় নীচ, প্রবঞ্চক রামদাস, স্বার্থপর গবেশরায়ের কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে লেখকের ব্যঙ্গ প্রবণতা অদৃশ্য থাকেনি। অন্যদিকে সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ হাওড়া স্টেশন থেকে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দাম্ভিক ও শোষক জমিদার কালীনাথ ধরের রাজহাটের বাড়িতে উপণীত হয়। রাজহাটে বিদ্যালয় স্থাপন ও গ্রামীণ জীবনের স্বার্থপরতা বিদ্যালয়ে বিদ্যাদান করা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের বেতন না পাওয়া এবং বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের কুলীণ আচরণের পরিচয় রামকিশোর

Dhaka University Institutional Repository

চট্টপাধ্যায়ের বিমলা নামী নারীকে ৪৮ নম্বর বিবাহকরণ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি সমূহ লেখকের কলমের আঁচড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিমলার সহোদর অতুলের সূত্রে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিমলার সম্পর্ক এবং ধরজীর পুত্রের বিবাহের পর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিমলার রাজহাট ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা এই সূত্রে বর্ণিত অন্যদিকে মধুসূদন ও গবেশরায়ের কলকাতা পৌছান ও নরেন্দ্রের অনুসন্ধান এবং রামদাসের কাছ থেকে সংবাদ পাবার পর নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রাজহাটের দিকে যাত্রা একাদশ পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দু'টি মৃত্যু দৃশ্য অঙ্কিত। প্রথমটি কালীনাথ ধরের পুত্র গোবিন্দের অকাল মৃত্যু, অন্যটি নরেন্দ্রনাথের পিসীর অন্তর্ধান। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপদাস বাবাজীর গোপালপুরের আখড়ায় বিমলা ও নরেন্দ্রনাথকে লেখক উপস্থিত করেছেন। এই আখড়ায় নরেনের কলকাতা যাত্রা, বিমলার গর্ভপাত, রামদাস ও নরেন আখড়ায় আগমনের পর বিলমাকে না পাওয়ার ঘটনা রূপায়ণে মূলকাহিনীর করুণ পরিণতির বীজ অংকুরিত হওয়ার জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বিমলা আখড়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বলরামপুরে রামের মায়ের নিকট আশ্রিত হিসেবে দিনযাপন করতে থাকে কিন্তু রামপুরের অবস্থাশালী ভরত ঘোষের মূর্খপুত্র সীতানাথ কর্তৃক বিমলা অপহৃতা হওয়ার সময় আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে রামদাস ও নরেন্দ্রনাথের অভিযোগ সূত্রে নবীনঘোষ নামক বদনগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার শ্রীরূপদাস ও তার বৈষ্ণবীদের গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয়।

বিংশ পরিচ্ছেদে বিমলার মৃত্যুর পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বীকারোক্তি প্রদান এবং সেই সূত্রে একবিংশ পরিচ্ছেদে বিচার দৃশ্যে শ্রীরূপদাস ও তার বৈষ্ণবীদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ও প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন ও মিথ্যা সংবাদ ও মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে রামদাসের সাত বছরের দ্বীপান্তর ও পরিশেষে

Dhaka University Institutional Repository

নরেন্দ্রনাথের কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও পঁচিশ টাকা বেতনের চাকুরী গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যদিয়ে 'কল্পতরু'র কাহিনী সমাপ্ত হয়।

'কল্পতরু'তে কেন্দ্রীয় চরিত্র নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে কাহিনীর যে গতিপ্রকৃতি বিবৃত হয়েছে তাতে ব্যঙ্গ রসের অবতারণা ছিল অনিবার্য । বিশেষত চরিত্রের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা এবং কলকাতা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিবৃতিতে ও সমকালীন সমাজের বিচিত্র অনুষঙ্গে ব্যঙ্গ বর্ণনাভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষত ব্রাহ্ম সমাজকে ব্যঙ্গ করার জন্য লেখক নরেন্দ্রনাথকে নির্বাচন করেছেন।

"নরেন্দ্রনাথ যথাকালে সমাজে গেলেন। যখন বক্তৃতা হয়, তখন আমাদের দেশের দুর্দশা, স্ত্রীগণের অধীনতাই যাহার দেদীপ্যমান সাক্ষী স্বরূপ এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে নরেন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইবেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সমাজের কার্য্য শেষ হইল।"(বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৮, পৃ ঃ ৫৫)

এমন কি নরেন্দ্রনাথের রূপ বর্ণনায় লেখক যে স্থূল চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে ব্যঙ্গ দৃষ্টি অপ্রকাশিত থাকেনি। আবার কলকাতার গদিয়ানবাবুর কাছ থেকে নরেনের সংবাদ না পাওয়ায় তাদের বাড়ি ও পিসীর অবস্থা বর্ণনায় লেখক ব্যঙ্গ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন ।

"তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাক ঝাড়তে উঠান সর্ব্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল, ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোনা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।"

(বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৮, পৃ ঃ ৬২)

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি মধুসূদনের ভ্রাতৃ চিন্তায় দু-বারের অন্ন এক আসনে উদরস্থ করা ও তৃপ্ত না হওয়ার বিবরণও লেখক উল্লেখ করেছে। বনবিষ্ণুপুরের গবেশচন্দ্ররায়ের আচার আচরণ ও পরিচয়ে লেখক ব্যঙ্গদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। গবেশচন্দ্রের আকৃতি বর্ণনায় এবং স্টেশনে তার আচরণের একটি অংশ স্মরণীয়ঃ

"বাস্তবিক গবেশ রায় সে একজন অসমসাহসিক লোক, ইহা তদীয় মূর্ত্তি দর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, কোন রকম শূকর-শেকর-সম্মার্জ্জণীর শাসনে অল্পপ্রতি প্রতিবিবৃত্ত চক্ষু দুটি প্রকান্ড, যেন পান্শী নৌকায় পিতলের চোক। কাণের পরিবর্তে, যেন দূর্গপ্রতিমার হস্তস্থিত পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া দু আধখানা করিয়া মস্তকের দুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গালে মাংস সরিয়া গিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, সুতরাং নাকটি যেন চিতল মাছের পিঠ। গোঁপের নীচে দাঁত, দাঁতের নীচে চিবুক। ঠোঁট ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গন্ডার চর্ম্মী গবেশের দেহে অস্থি থাকাতে শরীর যেন ঢেউখেলান। বর্ণ পিতলের মত। গবেশ রায় না বেটে, না লম্বা।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৮, পৃ ঃ ৬২)

জমিদার কালীনাথ ধরের বিবরণে ব্যঙ্গ দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। ধরজীর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যে চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন তাতেও সরস বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।

"বাবু কলিকাতা হইতে ধানগাছ দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং অদ্যকার বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এখানে আসিয়া জানিতে পারেন যে, তখন ধানের সময় নয়; সুতরাং ধান্য একেবারে রোপিত হইলে চিরদিন বাড়িতে থাকে না; এই কথা শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হন, এবং অদ্য তাহাই লইয়া খেদ করিতেছিলেন, নিশ্চিন্তপুরের পাঁচ ব্যক্তি অবহিতচিত্তে ইহা শুনিতেছিল এবং বাবুদ্বয় ধানের কলম লইবার যে বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছিল।"

(বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৮, পৃ ঃ ৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

রামাদাসের বৃত্তান্তে কলিকাতার হরিদাসের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনা বিদ্রূপাত্মক। গবেশচন্দ্র রায়ের মধুসূদনের বিবাহ প্রদান এবং এই উপলক্ষ্যে তার সঞ্চিত ধন কুক্ষিগত করার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।

একবিংশ পরিচ্ছেদে বিচারালয়ের দৃশ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কনে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত ইংরেজ বিচারকদের বাংলা ভাষার সংলাপ ও বিচার কার্যের অবহেলা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো এ-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত।

"যোড়করে গলা লগ্না কৃতবাসে নিত্যনন্দ দাস, জাতিতে তন্তুরায়, ব্যবসায় বস্ত্রবয়ন, জজ সাহেবের সমক্ষে নিজ প্রার্থনা জানাইল। জজ বুঝিলেন, এ ব্যক্তি রীতিমত সময়ে উপস্থিত হয় নাই, যেই জন্য এ প্রকার করিতেছে বুঝিয়া বলিলেন,- 'কেন টোমার জন্য আইন নহে, সাডারনের জন্য হইয়াছে, অটের দোষ করিলে সাজা লইটে হইবে। আমি টোমার পচাশ রোপেয়া জোরমানা কোরিল।"

(বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৮, পৃ ঃ ১৪৯)

বস্তুত 'কল্পতরু' গ্রন্থের কাহিনীর মূল ধারায় করুণরস সঞ্চারিত হলেও বিভিন্ন অংশের সরস বর্ণনা ও ব্যঙ্গ চিত্র গ্রন্থটিকে উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য রচনার ধারায় অনন্য সৃষ্টি কর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছে সাংবাদিকসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে লেখক নরেন্দ্রনাথকে বিচিত্র ঘটনার সূত্র জালে বিন্যস্ত করে তাকে কল্পতরু বলে যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। তবে অবান্তর মন্তব্য ও টীকা টিপ্পনী এই গ্রন্থের শিল্প সার্থকতার পরিপন্থী বিষয়। মূলত ইন্দ্রনাথ তৎকালীন স্বাধীন ভাব বিরোধী প্রাচীন সমাজের অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপবাণ গদ্য কাহিনীতে সঞ্চারিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমবিকাশমান কলকাতা সমাজ কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয় তার সঙ্গে বাংলা গদ্যের উদ্ভব প্রক্রিয়া একীভূত ছিল। বাংলা গদ্য বিকশিত হয় মূলত ধর্ম-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার ও সমাজ সংস্কারকে অবলম্বন করে। বাস্তব সমাজের বিচিত্র অনুষঙ্গ এ সময়ের গদ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে বিশেষত সামাজিক অসঙ্গতি গদ্যের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে চিত্রিত হয়। সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গদ্য রচনার প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক সক্রিয় থাকে। সমসাময়িক সমাজের বহিরঙ্গ বিভিন্ন চরিত্রের আচার ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গদ্যে প্রথম ব্যঙ্গ রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে সমকালীন কলকাতার বাস্তবচিত্র নক্সা আকারে রূপায়িত হয়। তাঁকে সামাজিক বিকারগ্রস্ততাকে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে গিয়ে ব্যঙ্গ প্রবণতার আশ্রয় নিতে হয়েছ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমকালীন যুগের প্রয়োজনে লেখনি ধারণ করেন। তাঁর বাদ-প্রতিবাদ মূলক ও প্রচারমূলক পুস্তিকা সমূহে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের স্বাক্ষর রয়েছে। 'অতি অল্প হইল' ও আবার অতি অল্প হইল-' বেনামীতে রচিত এই দুটি ব্যঙ্গ রচনায় সমকালীন বহুবিবাহ আন্দোলনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া কে তুলে ধরেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি এই ক্ষেত্রে কথ্যভাষার কাছাকাছি পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের মনোভাব নিয়ে রচনা করেন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' তাঁর এ রচনায় মদ্যপান ও মদ্যপানের পরিণতিকে কেন্দ্র করে ঘটনা সৃষ্ট হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ-'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'য় উনিশ শতকের কলকাতা শহর ও অন্যান্য অঞ্চলের সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচার ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ও হাস্যরসে রূপায়িত করেছেন। মূলত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনে যে পরস্পর বিপরীত মুখী স্রোতের আবর্তে অনাচার ও কলুষতার স্রোত প্রবাহিত হয় তারই ব্যঙ্গাত্মক রূপায়ণ কালীপ্রসন্ন সিংহ-এর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা ভাষার ব্যঙ্গ সাহিত্যের সার্থক প্রবর্তক। 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'- গ্রন্থে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্তের আচার আচারণকে নির্মল ব্যঙ্গের তুলিতে প্রকাশ করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ রচনায় ব্যঞ্জনাময়, পরিমিত ও সংযত মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত লঘু বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর কথা বলার দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রে লক্ষ করা যায়।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'- মীর মশাররফ হোসেনের ব্যঙ্গ রচনার অন্যতম নিদর্শন । এতে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে। গাজী মিয়াঁর আত্মপরিচয় ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সূত্রে মুসলিম ও হিন্দু সমাজের সামাজিক অনাচার অসঙ্গতি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে এই গ্রন্থে উচ্চারিত। মীর মশাররফ হোসেনের ব্যঙ্গ রচনায় সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য ব্যঙ্গ রচয়িতাদের থেকে স্বতন্ত্রধারার ছিলেন। কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্যে ত্রৈলোক্যনাথ পরিভ্রমণ করেছেন বাস্তব ও অলৌকিক জগতের বিস্তৃত পরিসরে। তাঁর 'কঙ্কাবতী' এবং 'ভূত ও মানুষ' রূপকথার আঙ্গিকে ব্যঙ্গ রচনার অন্যতম নিদর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গদ্যে ও পদ্যে 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' রচনা করে ব্যঙ্গ রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মানুরাগী নব্যশিক্ষিত ও মধ্যবিত্তকে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্রের অবতারণা উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে ইন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সূচনা করেন ।

প্রথম যুগের ব্যঙ্গ রচনার রস পরিণতি ও আঙ্গিকের সঙ্গে পরবর্তীকালের ব্যঙ্গ রচনার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। লোকরঞ্জন নকশাতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সামাজিক মানুষ ও তাঁর ব্যাধিকে নিয়ে ব্যঙ্গ রচনার সূত্রপাত করেন। এ সব রচনায় নিটোল কাহিনীর বিস্তার ও পরিণতি দেখা না গেলেও খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে রচয়িতারা তাঁদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। আদি, মধ্য, অন্তযুক্ত উপন্যাসের কাহিনীর আঙ্গিক কিংবা চরিত্রের ক্রমবিকাশ এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নব্য ধনিক শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্ছৃঙ্খল অনভিপ্রেত আচরণ বর্ণনায় ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খণ্ড আখ্যায়িকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

নকশা জাতীয় রচনার ভাষা কথ্য ও অকথ্যের মিশ্রণে এবং সাধুভাষার সংস্পর্শে কৌতুকপদ হয়ে উঠেছে। মীর মশাররফ হোসেন, বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ ও ইন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ কাহিনীকে বিবৃত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ রচনায় কখনো পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, আবার কখনো খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনার আশ্রয় নিয়ে ভাবগর্ভ সরস ও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জল কৌতুক রসাশ্রিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। মীর মশাররফ হোসেন বৃহৎ পরিসরে বাহুল্য বর্ণনে ব্যঙ্গ সৃজনে সচেষ্ট হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ত্রৈলোক্যনাথ ও ইন্দ্রনাথ, পূর্ণাঙ্গ কাহিনী সৃষ্টিতে উপন্যাস সুলভ মনোদৃষ্টির পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। সমসাময়িক সমাজ ও প্রতিবেশের সমালোচনা এ সব ব্যঙ্গকারদের মৌল অন্বিষ্ট।

কখনো শিক্ষণীয় উপদেশ আবার কখনো বা কৌতুককর পরিণতিতে অধিকাংশ ব্যঙ্গকার তাদের গ্রন্থে উপসংহার সৃষ্টি করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ রচনার শৈলীতে মাত্রাজ্ঞান ও সরলতার নিদর্শন দুর্লভ নয় । অধিকাংশ লেখক সংযমের পরিচয় প্রদান করেছেন। ব্যঙ্গ কৌতুকের ক্ষেত্রে মাত্রাজ্ঞান ও সরলতা একটি অনস্বীকার্য উপকরণ ।

মূলত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ইন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেক গদ্যরচয়িতা সমকালীন সমাজের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে উৎসাহিত হয়েছেন । কখনও রক্ষণশীল মনোভাব থেকে সমকালীন প্রগতিশীল রুচি ও আদর্শকে ব্যঙ্গ করেছেন। আবার কখনও প্রগতিশীল মনোভাব থেকে সমকালীন মানুষের সমাজ ও ধর্মীয় অনুষঙ্গে রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছেন। এ ছাড়া সমাজ প্রগতির অনিবার্য ধারার স্রোতে অবগাহনের জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যঙ্গ রচনার সূত্রপাত ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ রচনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে আমি, বাংলা গদ্যের উৎস স্রোতের ব্যঙ্গ রচনার বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি।

কোন কোন ব্যঙ্গকারের রচনায় রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি যেমন লক্ষণীয় তেমনি আবার কেউ কেউ প্রগতিশীল ধ্যান ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামাজিক ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ সক্রিয় থেকেছে বেশী। সমাজ বা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আমোদজনক ব্যঙ্গ রচনার নিদর্শনও উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যে লক্ষ করা যায়। মননশীল গদ্যে ও সূক্ষ্ম কল্পনায় সমাজ অন্তর্গত মানুষের বিকৃতি রূপায়ণের দিকে ব্যঙ্গকারদের মনোনিবেশ লক্ষ করা যায়।

এ গবেষণায় আমি উপলব্ধি করেছি ব্যঙ্গ অর্থ গুরুতর জীবন সত্যকে রস দৃষ্টিতে উপস্থাপন। যে সব অসঙ্গতি ও বিকৃতি সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না তারই পুঙখানুপুঙখ চিত্র ব্যঙ্গ রচনায় উপস্হাপিত হয়। এ সব রচনায় লেখকের সমবেদনা একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সমাজ সংশোধনের জন্য বিশেষ আচার ও সংস্কারকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করা উনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গকারদের অন্যতম একটি প্রবণতা ছিল।

মূলত উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যে ব্যঙ্গ দৃষ্টি ভঙ্গি চিত্রিত হওয়ায় বাংলা গদ্য রীতিতে সঞ্চারিত হয়েছিল বেগবান গতি। বাংলা গদ্য সচল সুতীক্ষ্ণ সরল, সহজ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ রচনা সমূহের ছিল সুদূর প্রসারী ভূমিকা ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থ ঃ

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র	ঃ	বঙ্কিমরচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ	ঃ	কলিকাতা কমলালয়, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, শনিরঞ্জন প্রেস, কলকাতা।
		নববাবু বিলাস, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, শনিরঞ্জন প্রেস, কলকাতা।
		নববিবি বিলাস, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, শনিরঞ্জন প্রেস, কলকাতা।
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র	ঃ	রচনা সংগ্রহ, ১৯৫৮, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার।
বিশী, প্রমথনাথ	ঃ	(সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ	ঃ	ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (২য় খন্ড),
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার	ঃ	(সম্পাদিত), ইন্দ্রনাথ স্মৃতি সমিতি, (তারিখ বিহীন), কলকাতা।
মিত্র,প্যারীচাঁদ	ঃ	প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ১৮৫৮, টেকচাঁদ ঠাকুর বিরচিত, কলকাতা।
মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ	ঃ	ত্রৈলোক্যনাথ গ্রন্থাবলী (২য় খন্ড), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, (তারিখ বিহীন), কলকাতা।
সিংহ, কালীপ্রসন্ন	ঃ	হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, (১ম ও ২য়) ভাগ, ১৩৪৪, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
হোসেন, মীর মশাররফ	ঃ	মশাররফ রচনা সম্ভার (তৃতীয় খন্ড), ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান	ঃ	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৭১, বাংলা একাডেমী , ঢাকা।
গুপ্ত, ক্ষেত্র	ঃ	বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাস, কলকাতা (তারিখ বিহীন), আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ১৯৯২, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা।
ঘোষ, অজিত কুমার	ঃ	বঙ্গ সাহিত্যে হাস্য রসের ধারা, ১৯৬০, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা।
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার	ঃ	কালের পুত্তলিকা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ডি.এস, লাইব্রেরী, কলকাতা।
চৌধুরী, মুনীর	ঃ	মীর মানস, ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী , ঢাকা।
চৌধুরী, আবুল কাশেম	ঃ	বাংলা সাহিত্যের সামাজিক নক্শাঃ 'পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
জাহাঙ্গীর, সেলিম	ঃ	মীর মশাররফ হোসেনঃ জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ	ঃ	প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য, ১৯৮৯, জয়দূর্গালাইব্রেরী, কলকাতা।
পোদ্দার, অরবিন্দ	ঃ	বঙ্কিম মানস, ১৯৫১, উচ্চারণ, কলকাতা,
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার	ঃ	বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার	ঃ	বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, মহাত্মা গন্ধী, কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ	ঃ	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ১৯৭১, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভট্টচার্য, আশুতোষ ঃ বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

মুরশিদ, গোলাম ঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রায়, রথীন্দ্রনাথ ঃ সাহিত্য বিচিত্রা , ১৯৬১ 'জিজ্ঞাস', রায়বিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা।

শাস্ত্রী, শিবনাথ ঃ রামতনু লাহিরী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, ১৯৫৭, নিউএজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সেন, রজনীকান্ত ঃ বাংলা গদ্যের চারযুগ, ১৯৫৯, দাশগুপ্ত এন্ড কোং , কলকাতা।

সিকদার, অশ্রু কুমার ঃ (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর' নির্বাচিত রচনাঃ সাহিত্য ও সমাজ, ১৯৭১, জয়ন্তী সমিতি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ঃ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৩৮, পশ্চিম গ্রন্থমেলা, কলকাতা।

সুর, অতুল ঃ আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী ১৯৮৫, বঙ্গবানী পিন্টাস, কলকাতা।

হুমায়ূন, রাজীব ঃ (সম্পাদিত), আবুল মনসুর আহমেদের ব্যঙ্গ রচনা, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

J.H. Ciuddon : A Dictonary of literary terms. revised ed, 1979, England penguin Books.

Encyclopadia Britannica, Vol-5.London.

Northrop Frye : Anatomy of Criticism,Princeton, New Jersey
Princeton University Press, 10th Hardcover Printing,1971

Robert Scholer & Robert keidogg : Meaning in Narrative,1966, New york, Oxford University press.